তিন শূন্য

তিন শূন্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র শীল
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১এ, ঠাকুর ক্যাসল স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বেঁধেছেন : জি. রায় এণ্ড কোং
২২, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট অংকন : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক প্রস্তুতকারক ও মুদ্রণ :
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ

প্রথম আনন্দ-সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৬

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

এক রাত্রি

গ্রাম হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে জনহীন প্রান্তরে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে দেবস্থলটি মনোরম। দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, বহু বর্ষ পূর্ব্বে নদীর সিকতা-ভূমির উর্ব্বরতায় জঙ্গলটির জন্ম হইয়াছিল। এখন নদীটি প্রায় আধ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন-শিমুল-বন্যজামগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডগুলি জনতার মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীচে নানা প্রকারের লতা আর গুল্মে সমাচ্ছন্ন। এই ঘন বন-সন্নিবেশের মধ্যে—প্রায় কেন্দ্রস্থলে, পরিচ্ছন্ন খানিকটা—বিঘা দুয়েক জমির উপর প্রাচীন একটি মন্দির। মন্দিরটির রঙ কালো কঠিন, দেখিয়া মনে হয়, যেন অখণ্ড একটা ছোট পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া গড়া। বিগত হইয়া যাওয়া শতাব্দীর অন্ধকারের ছায়া দিন দিন যেন ঘন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে জীর্ণ একটি নাটমন্দির। এমনই কালো, তবে অখণ্ড বলিয়া মনে হয় না। খিলানে খিলানে ফাট ধরিয়াছে। নাটমন্দিরের দুই পাশে দুইখানি মাটির ঘর। একখানি ভোগ মন্দির, অপরখানি সাধক-সন্ন্যাসী কেহ আসিলে থাকিতে দেওয়া হয়। তান্ত্রিক সাধনার বহুবিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত; এখন পশুবলি হয়—ছাগল, ভেড়া, মহিষ; এক এক বিশিষ্ট পর্ব্বে শতাধিক পশুর রক্তে নাটমন্দিরের চত্বর ভাসিয়া যায় এবং দেবীমন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে পশুমুণ্ডের স্তূপ গড়িয়া উঠে। মন্দিরের ডান দিক ভৈরব-তলা—প্রাচীন একটি শিমুলগাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাঁ দিকে সিন্দূরলিপ্ত কতকগুলো নরকপাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত ঐ নরকপাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকেন। নিত্য প্রভাতে দেখা যায়, নরকপালগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; পুরোহিত নিত্য সেগুলিকে গুছাইয়া রাখে। দেবীর খল খল হাসিতে, ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া ; গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে। রাত্রে ঐ

দেবস্থলে কেহ বড় থাকে না। প্রাচীনকাল হইতে ভূমি-বৃত্তিভোগী পুরোহিত সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়াই গ্রামে আপন গৃহে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতেই আরম্ভ হয় দেবলীলা। কখনও কখনও দুই-দশজন অসমসাহসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহ থাকিতে পারে নাই। বাকি সকলে অর্দ্ধরাত্রেই পলাইয়া গিয়াছে, দুই-একজন পাগল পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন সন্ন্যাসী আসে প্রত্যহই, কিন্তু দিনে প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামে বা স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

পুরোহিত কন্যার মত আদর করিয়া দেবীকে বলেন, ভয়ঙ্করী আমার ক্ষ্যাপা মেয়ে।

সেদিন শ্রাবণসন্ধ্যায় আকাশ-জোড়া ঘন মেঘ; কিন্তু বর্ষণ ছিল না। গুমট গরমে দেবস্থলের বনসমারোহের মধ্যে নিথর স্তব্ধতা থম থম করিতেছিল। নীচে লতাগুল্মের অন্তরালে গুমটক্লিষ্ট সরীসৃপের সঞ্চরণ আজ ইহারই মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করিলেন। অন্য দিন বরং দুই-চারিজন ভক্তিমান গ্রামবাসী আরতির সময় আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ আর কেহ আসে নাই; কেবল ঢাক লইয়া আসিয়াছিল চাকরান-জমিভোগী ঢাকীটা। আর ছিল দুইজন আগন্তুক সন্ন্যাসী। একজন আসিয়াছে সকালে, একজন দ্বিপ্রহরে, দেবীর ভোগের পূর্ব্বেই; ওবেলায় এইখানেই প্রসাদ পাইয়াছে। পুরোহিত ভাবিয়াছিলেন, অপরাহ্নেই চলিয়া যাইবে। তিনি এ দেবস্থলের ভয়ঙ্করত্বের কথা সবই বলিয়াছেন। আরতি শেষ করিয়া পুরোহিত দেখিলেন, জোয়ান সন্ন্যাসীটি আপনার জিনিসপত্র গুছাইতেছে; কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এখনও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অদ্ভুত ঘুম লোকটার, ঢাকের বাজনাতেও ঘুম ভাঙিল না। কিন্তু পুরোহিত কাছে আসিয়া দেখিলেন, লোকটা ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া চোখ মেলিয়া শুইয়া আছে। পুরোহিত ডাকিল, বাবাজী! ওহে গোঁসাই!

লোকটা উঠিয়া আসিয়া আমড়ার আঁটির মত চোখ দুইটা মেলিয়া বোকার মত বলিল, আঁ?

তুমি যাবে না নাকি? এত কথা বললাম তোমাকে—

লোকটা অত্যন্ত কৌতুকে হে॰-হে॰-হে॰ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিটা কিন্তু রূঢ় নয়, বিনীত এবং নির্ব্বোধ। হাসিয়া সে বলিল, বেশ থাকব বাবা এইখানে। বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল, হে॰-হে॰-হে॰। তিনটি দ্রুত হে॰ শব্দে এক টুকরা বিনীত নির্ব্বোধ হাসি।

পুরোহিত বলিলেন, এই দেখ, এ মহা ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে ওসব পাকামি ক'র না।

সবিনয়ে অকারণে অর্থহীনভাবে হাসিয়া লোকটা বলিল, আজ্ঞে, বেশ থাকব বাবা। 'কালী কালী' ব'লে কাটিয়ে দোব—হে॰-হে॰-হে॰। সেই নির্ব্বোধ দ্রুত হাসি।

পুরোহিত এবার নীরবে লোকটার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন। মাথায় কাঁচাপাকা একমাথা বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, স্থূলে সরল দৃষ্টিভরা বড় বড় দুইটা চোখ, দন্তহীন তোবড়ানো মুখ। লোকটার উপর মায়া হয় না, দয়া হয়। অতিথিশালার দাওয়ার উপরেই একটা ধুনি জ্বলিতেছিল—লোকটা ধুনিতে কাঠ ফেলিয়া দিয়া গাঁজা টিপিতে বসিল। পুরোহিত তাহাকে তখনও দেখিতেছিলেন; সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল, হে॰-হে॰-হে॰।

পুরোহিতের সহসা মনে হইল, লোকটি বোধ হয় গুপ্ত সাধক। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত উত্তাপও যেন তিনি অনুভব করিলেন। বলিলেন, তা হ'লে বাবা, আপনি—

হে॰-হে॰-হে॰ করিয়া হাসিয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ বাবা, যান আপনি, বেশ থাকব আমি।

অপর সন্ন্যাসীটি ততক্ষণ জিনিসপত্র বগলে করিয়াও নীরবে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। সেও এবার জিনিসপত্র নামাইয়া বলিল, তা হ'লে আমিও থাকি বাবা এইখানেই।

লোকটি ভরা জোয়ান, একচাপ কালো রুক্ষ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় তৈলহীন চুলগুলি লম্বা, কিন্তু বেশ বিন্যস্ত। পরণে গেরুয়া বহির্ব্বাস, গায়ে একখানা গেরুয়া চাদর।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বলিল, কেন বাবা, বেশ তো থাকতে পারে! এবার আর সে হাসিল না। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর সুপরিস্ফুট। কিন্তু পুরোহিত

বলিলেন, থাকুন বাবা, উনিও থাকুন; একা না বোকা। তা উনি না হয় ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় থাকবেন।

জোয়ান সন্ন্যাসী বিনাবাক্যব্যয়ে নাটমন্দিরের ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর গিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসিল। পুরোহিত আর অপেক্ষা করিল না; আলোটি হাতে করিয়া সঙ্কীর্ণ বনপথের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

আলোটা চলিয়া যাইতেই দেবস্থল মুহূর্তে ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সে অন্ধকার যেন পৃথিবীর দিবারাত্রির অন্ধকার নয়, কুটিল, নিথর, গম্ভীর। সন্ন্যাসী মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল, তারপর ফুঁ দিয়া ধুনিটা জ্বালাইয়া তুলিল। শূলবিদ্ধ অন্ধকারের বুকের উচ্ছ্বসিত রক্তধারার মত আলোকশিখা জ্বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিল, হে'-হে'-হে'। হাসিয়া সে ছোট কল্কেতে হাতের গাঁজাটুকু সাজিয়া আগুন চড়াইল। আপন মনেই বলিল, গেরামে গিয়ে ফেসাদে পড়ি আর কি। হাজার কৈফিয়ৎ। তার চেয়ে বাবা অরণ্য ভাল। দশ বছর অরণ্যে অরণ্যে কেটে গেল বাবা, হে'-হে'-হে'।

মহাদেবের প্রসাদ পাব বাবা? জোয়ান সন্ন্যাসীটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল, ধুনির আলোতে অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত দেখাইতেছে তাহাকে।

প্রসাদ পাব বাবা?

হে'-হে'-হে'। ব'স বাবা, ব'স। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সজোরে দম দিয়া কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে দমটা ছাড়িয়া সে প্রশ্ন করিল, কোথায় আশ্রম বাবাজীর?

আশ্রম? তরুণ সন্ন্যাসী হাসিল। তারপর বলিল, দুনিয়াময়ই আশ্রম বাবা; যেদিন যেখানে থাকি, সেইখানেই আশ্রম।

হে'-হে'-হে'। আমারও তাই বাবা। প্রৌঢ় আবার সেই হাসি হাসিল, হে'-হে'-হে'। কল্কেতে আবার দম দিয়া সে নীরবে কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। তরুণ সন্ন্যাসী দম দিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল, আর নাই। দুইজনেই কিছুক্ষণ ভোম হইয়া বসিয়া রহিল।

লঘু দ্রুত পদশব্দ—তাহার পরই খট খট শব্দে দুই-তিনটা নরকপাল

স্তূপচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়িল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সচকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করিয়া চাহিল। আবার লঘু পদশব্দ, আবার দুইটা নরকপাল গড়াইয়া পড়িল।

প্রৌঢ় বলিল, শেয়াল। মড়ার মাথার ওপর দিয়ে বেটাদের পথ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসীও হাসিল, সেও দেখিয়াছে। প্রৌঢ় বলিল, জমল না। আর একটু হোক, কি বল? সে গাঁজা বাহির করিয়া বসিল।

তরুণ সন্ন্যাসী একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। প্রৌঢ়ই বলিল, কে কে আছে বাবা, তোমার বাড়িতে?

কেউ না। মা ছিল, ম'রে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

কোথা বাড়ি ছিল?

বাড়ি?

হ্যাঁ, বাড়ি।

সে শুনে আর কি করবে?

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রাত কাটানো নিয়ে কথা বাবা।

তরুণ বলিল, তোমার বাড়ি কোথা ছিল বাবা?

কল্কেতে গাঁজা সাজিতে সাজিতে প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, বলিল, কে জানে? আমি সন্ন্যাসী সেই ছেলেবেলা থেকে। অঘোরপন্থীরা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কল্কেতে আগুন চড়াইতে চড়াইতে বলিল, অঘোর-পন্থীরা মড়ার মাংস খায় চিমটেতে ক'রে ধ'রে চিতার আগুনে ঝলসিয়ে —বেশ লাগে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে হাসিয়া উঠিল। তারপর সে গাঁজায় দম দিল। পালা করিয়া গাঁজার কল্কে হাতে হাতে ফিরিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজার কল্কে উপুড় করিয়া দিয়া তরুণ বলিল, কঙ্কালী মহাপীঠে এক সাধু ছিল, ছেলেবেলায় আমরা দেখেছি: সে খেত।

কঙ্কালীতলা? বীরভূম জেলা?

হ্যাঁ। গিয়েছ সেখানে? কোপাইয়ের উপর মহাশ্মশান।

হেঁ-হেঁ-হেঁ। প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল। নবগ্রামের রামবাবুকে জানতে? অ্যাই দশাশয়ী পুরুষ; এই একগুলি আফিম খেত। 'পাট-ভাণ্ডার' পাড়ে

থাকত কাছারির সিমেণ্ট-করা দাওয়াতে। 'গ্রুক গ্রুক' গড়গড়ার নলে আর মুখে। তামাক ফুরুলেই হাঁক—লাল—রূপ! সঙ্গে সঙ্গে কল্কে হাজির —হোজোর! প্রৌঢ় নিজেই হাত বাড়াইয়া যেন কল্কে আগাইয়া দিল।

তরুণ সন্ন্যাসীর নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল; চোখ দুইটি অতি কষ্টে বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, রূপলাল?

প্রৌঢ় বলিল, হ্যাঁ, রূপলাল, সেই ইয়া দুটো বড় বড় দাঁত! এই বড় বড় চোখ! 'বক্তিতা' করত! বলত, "করকে বলি রে—কর, তুই হরিমন্দির পরিস্কার কর—কর আমার সে কর্ম্ম দুষ্কর মনে ক'রে তস্কর-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। একবার সবাই হরি হরি বল।" সে হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল গমকে গমকে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। প্রৌঢ় আবার বলিল, নারদের বক্তিতে! বাবু শুনতে খুব ভালবাসতেন। বাবু খুব ভালবাসতেন রূপলালকে। আদর ক'রে বলতেন, লালরূপ।

অকস্মাৎ কাহার ক্রুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দে দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। কে? ঘাড় উঁচু করিয়া দুইজনেই নাটমন্দিরের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় জ্বলন্ত কাঠটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শালা! তরুণ সন্ন্যাসী চিমটা লইয়া উঠিল। একটা সাপ, 'আলো ও মানুষ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তরুণের হাত ধরিয়া বসাইল। মরুক বেটা, তুমি ব'স।

তরুণ বসিয়া এবার প্রশ্ন করিল, রূপলালকে তুমি চিনতে? এতক্ষণে তাহার প্রশ্নটা সম্বন্ধে খেয়াল হইয়াছে।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রামবাবুর কাছে আমি যেতাম যে, হরদম যেতাম! ঠাকুর-বাড়িতে থাকতাম। রূপলাল আমার কাছে থাকত। এই এতটুকু বেলা থেকে রূপলাল বাবুদের বাড়িতে থাকত। রামবাবুর কাকার কাছে শিখেছিল গাঁজা খেতে। লোকে তাঁকে বলত ছোটকত্তা। ছোটকত্তা গাঁজা খেতেন—ইয়া রুপোর কল্কে, আর সকাল থেকে গাঁজা ভিজানো থাকত গোলাপ-জলে। আতর দিয়ে সেই গাঁজা টিপে, চন্দনকাঠের কাটনিতে কেটে, সেজে দাঁত-বাঁকা বাঁড়ুয্যে হাতে ক'রে ধরত, ছোটকত্তা মুখ লাগিয়ে টানতেন। রূপলাল তখন ছোকরা। ছোটকত্তা ডেকে বলতেন, লে বেটা, পেসাদ লে। একটান টেনেই রূপলাল তিনদিন প'ড়ে ছিল নেশার ঘোরে। সে আবার সকৌতুকে

নির্ব্বোধের মত হাসিল, হে'-হে'-হে'। হে'-হে'-হে'। যেন মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

হাসি থামাইয়া সহসা সে গদগদ হইয়া উঠিল, বলিল, মহাশয় লোক ছিলেন ছোটকর্ত্তাবাবু। তিনিই ছিলেন বাবুদের মেনেজার। তাঁর হাতেই ছিল সব। রূপলালের দুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন তিনি রোজ এক পো ক'রে, ঠাকুরদের পেসাদী দুধ। তারপর আরম্ভ করলে দুধ চুরি ক'রে খেতে। চাষবাড়ি থেকে—

তরুণ সন্ন্যাসী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি কি জান হে বাপু?

প্রৌঢ় এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল, জানি জানি, সব জানি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনবার পথে পোঁ পোঁ ক'রে মেরে দিত আধ সের তিন পো। তারপর ঝরনার জল মিশিয়ে—। হা-হা করিয়া হাসিয়া সে আবার গড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া বলিল, ধরেছিলাম আমি একদিন রূপলালকে। তা রূপলাল কি করবে বল? ছোটকর্ত্তাবাবুর বরাদ্দ বাবুরা সব বন্ধ ক'রে দিলে। তখন আবার গাঁজার ওপর আফিম মদ দুই ধরেছে রূপলাল। রামবাবু ধরিয়েছিলেন আফিম, রামবাবুর ছেলে ধরিয়েছিল মদ। তা একটুকু দুধ না হ'লে—

বাধা দিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, দুধ চুরি ক'রে থাক, রূপলাল ভাল লোক ছিল।

প্রৌঢ় বলিল, শুধু দুধ? রূপলাল ঘোড়ার দানাও চুরি করত। তা বাবুদের বউরা কিছু বলত না, বলত নিক, দু-চার মুঠো ছোলাই তো!

তরুণ কঠিন হাসি হাসিয়া বলিল, বলবে কি? বলি, বলবে কি বউয়েরা? বউরা বলতে গেলে, বউদের কীর্ত্তিও যে রূপলাল ব'লে দেবে ব'লে শাসাত। বউরা যে দোকান থেকে সন্দেশ আনিয়ে খেত গুব গুব ক'রে!

প্রৌঢ় কিন্তু হাসিতেছিল। সে হাসি তাহার অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে চোখ পড়িতেই প্রৌঢ় দেখিল, চোখ তাহার ঝকমক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল, কি?

খপ করিয়া প্রৌঢ়ের হাত ধরিয়া যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি এত সব জানলে কি ক'রে?

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, বলিল, জানিস আমি কে?

কে?

হেঁ-হেঁ-হেঁ। অঘোরপন্থী। আমি মড়ার মাংস খাই। আমার বয়স কত জানিস?

কত?

দেড়শো বছর। আমি কর্ত্তাবাবুকে যখন দেখেছি, তখনও আমি এমনই। এখনও আমি এমনই। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বসিয়া রহিল। আপনার চামড়ার বালিশটি টানিয়া লইয়া তাহার উপর আরাম করিয়া বসিয়া প্রৌঢ় আবার হাসিতে আরম্ভ করিল, আমি সব জানি। কোথা কি হচ্ছে, তুই কি ভাবছিস, সব আমি জানতে পারি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনা ছাড়িয়ে দিলে রূপলাল দুধ খেত কি ক'রে জানিস? দুধের কড়াতে সরের ভিতর লম্বা একটা খড়ের নল পুরে দিত, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বাস্, কে ধরবে ধরুক।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, রূপলালের শুধু নিন্দেই করছ তুমি। অনেক গুণও ছিল তার! ছাই জান তুমি!

হেঁ-হেঁ-হেঁ। ছাই জানি আমি? তবে বলব, রূপলালের চাকরি কি ক'রে গেল? শুনবি? রসগোল্লা চুষে রস খেয়ে জলে চুবিয়ে নিয়ে এসেছিল; তাতেই তো চাকরি গেল রূপলালের। সব জানি আমি।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, তারপরে?

তারপর আবার কি? রূপলাল পালিয়ে গেল।

ছাই জান তুমি। খুঁটিতে বেঁধে জুতোপেটা করেছিল তাকে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড। রূপলালকে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল আর এক পাটি জুতো সেখানে রেখেছিল। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেই ডেকে বলে, মার এক জুতো। তাহার চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। এ লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই নির্ব্বোধ হাসি হাসিয়া বলিল, রূপলাল মারের দাম তুলে নিয়েছিল, তিনটে ঘাড় ভেঙে দিয়েছিল ঢুই ঢাই ক'রে। একটা সোনার চেন—

মাইনে দিলে না কেনে, তাই মায় সুদ উসুল ক'রে নিলে রূপলাল। তরুণ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হে঺-হে঺-হে঺। সে খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বলিল, লে, তৈরি কর।

দুইজনেই স্তব্ধ; এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দরূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির ঝিল্লি, ছোট পেঁচার কুঁক কুঁক শব্দ, বড় পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্ম্মর-শব্দ, দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি, সকলের উপরে সুদীর্ঘ গাছগুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাখার শব্দসমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। গাঁজা টানিয়া প্রৌঢ় হাসিল, সেই হাসি—হে঺-হে঺-হে঺। বলে, এখানে দানাদত্যি নাচে, ভৈরবনাথ ত্রিশূল হাতে ঘুরে বেড়ায়, মা কালী মড়ার মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলে। হে঺-হে঺-হে঺। মিছে কথা—সব মিছে কথা।

যুবক সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, উঁহু, ভূত মিছে নয়। জেলখানায় ফাঁসির আসামী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে—। অকস্মাৎ সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বাপ রে। থর থর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় তাহাকে ধরিয়া হাসিল, হে঺-হে঺-হে঺। ভয় লাগছে? হে঺-হে঺-হে঺।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া যুবক বলিল, খু-ব করুণ সুরে উঁ-উঁ ক'রে কাঁদে। ফোঁস ফোঁস ক'রে ফোঁপায়। ঠিক রাত্রি দুপুর থেকে রাত চারটে পর্য্যন্ত।

কাঁদে? ফোঁপায়?

হ্যাঁ। উঃ, সে যে কি দুঃখ তার! যুবক আবার শিহরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় এবার ঝুলি-ঝাপ্টা হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া বলিল, তোর পাত্তর আছে? নিয়ে আয়। নিজে একটা নারিকেল খোলা বাহির করিল।

যুবক ধুনি হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া ওদিকে অগ্রসর হইল, বলিল, সে শালা আবার কোথা আছে—

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, দূ-র বেটা। বাসুকীর ফণার ওপরে থেকে সাপের ভয়? হে঺-হে঺-হে঺।

পাত্র আনিয়া রাখিতেই প্রৌঢ় খানিকটা মদ তাহাতে ঢালিয়া দিল, নিজের পাত্র তুলিয়া লইল।

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সাধন-ভজন করবে না? নিবেদন করবে না?

ধে-ৎ! নিবেদন! নিবেদন ক'রে কি হবে রে? খেয়ে লে। পেটে গেলেই কাজ করবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যুবক বলিল, রামবাবু থাকলে কিন্তু রূপলালের এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। ভারী ভালবাসত, রামবাবু কখনও রূপলাল বলত না, বলত—লালরূপ। রূপলালও বাবুকে ভারী ভক্তি করত। বাবুর দুধে সে কখনও মুখ দিত না। বাবু ডাকত—লাল--রূ-প! না, হোজোর! জোড়হাত ক'রে রূপলাল দাঁড়াত। বাবুর অসুখ হ'লে লালরূপকে না হ'লে চলত না। অহরহ লালরূপকে চাই, টেপ বেটা, পা টেপ। সমস্ত রাত ব'সে ব'সে বাতাস করত। ঝুড়ি ঝুড়ি ময়লা, মেথরের মত রূপলাল ফেলত। বাবু বলত, তুই বেটা আমার ছেলে ছিলি রে আর জন্মে।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জানি রে জানি, একটুকুন অসুখ হ'লেই বাবুর পেট খারাপ হ'ত যে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসী উদাসকণ্ঠে বলিল, গিন্নীরা সব প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোত, ছেলেরা ঘুমোত। রূপলাল সারারাত জেগে ব'সে থাকত। টাকাকড়ি, বোতাম, ঘড়ি সবসুদ্ধ জামা বাবু রূপলালের হাতে দিত; একটি আধলা কখনও যায় নাই।

প্রৌঢ় হাসিল, সেই নির্ব্বোধের হাসি—হেঁ-হেঁ-হেঁ! তারপর বলিল, ওই দুধ মিষ্টি, ওতেই ছিল রূপলালের যত লোভ। লোভের জিনিস কিনা! হেঁ-হেঁ-হেঁ। আর বাবুদের বাড়ীতে একজনা ঝি ছিল, জানতে তাকে? কামিনী, কামিনী তার নাম। সেই রূপলালের ছিল সব। রূপলালই তাকে বাবুদের বাড়ীতে এনেছিল। একটি ছেলে ছিল কামিনীর। ভারী সুন্দর ছেলে—

কাত্তিক? তরুণ নেশায় আড়ষ্ট চোখ বিস্ফারিত করিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

হ্যাঁ, কাত্তিক।

যুবক বলিল, হ্যাঁ, সেই কাত্তিককে রূপলাল দিত কিনা দুধ সন্দেশ। লুকিয়ে লুকিয়ে দিত তাকে। কাত্তিক রামবাবুর নাতিকে কোলে নিয়ে থাকত। বাবুদের থিয়েটারে সে রাধা সাজত। প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া

সে হাসিয়া বলিল, আমরা সব খেলা করতাম কাত্তিকের সঙ্গে। ভারী ভাব ছিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জান, কাত্তিক যখন ছোট ছিল, তখন রূপলাল তাকে আদর করত। কামিনী কাজ করত, রূপলাল তাকে ঘুম পাড়াত। তা কাত্তিক আবার বলত, বাবা, তোমাকে আদর করি! রূপলাল বলত, কর কেনে। কাত্তিক বলত, তোর চোখে খুঁচে দি! বলিয়া প্রৌঢ় গমকে গমকে হাসিতে লাগিল। সে আবার নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া সঙ্গীর পাত্রও পূর্ণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ শৃগালের সমবেত উচ্চধ্বনিতে পেঁচার দীর্ঘ কর্কশ রবে বনভূমি মুখর চকিত হইয়া উঠিল, বাসায় বাসায় পক্ষবিধূনন ও দলে দলে উড়ন্ত বাদুড়ের পাখার শব্দে নিশীথিনী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ হইতে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

তরুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু যাবার সময় রূপলাল একবার দেখাও করলে না কাত্তিকের সঙ্গে।

প্রৌঢ় বলিল, জুতো খেয়ে রূপলালের ভারী লজ্জা হয়েছিল, তাই কামিনীর সঙ্গে, কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতেই পারে নাই। পালিয়ে গিয়েছিল। তা নইলে—

যুবক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাত্তিক ভারী কেঁদেছিল কিন্তু। খু—ব কেঁদেছিল।

প্রৌঢ় বলিল, তার পরেও রূপলাল একদিন গিয়েছিল, লুকিয়ে কামিনী-কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতে। তা ভাবলে, দেখলে তো তারা সঙ্গ ছাড়বে না। রূপলালের কি-ই বা ছিল যে, তাদের খাওয়াত, বল? তাতেই আর—

রূঢ় স্বরে যুবক বলিল, রূপলালও যা খেত তারাও তাই খেত। না হয় উপোস ক'রেই থাকত। কাত্তিক তো বাঁচত তা হ'লে!

কাত্তিক ম'রে গিয়েছে?

যুবক চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রৌঢ় বলিল, বাবুর নাতি যে রূপলালকে দেখে 'রূপলাল রূপলাল' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। রূপলাল ছুটে পালাল। ধরলে তো ছাড়ত না বেটা বাবুরা, ধ'রে পুলিশে দিত চুরির জন্যে। খানিকটা দূর গিয়ে রূপলাল দেখলে, ছেলেটা নেই! তার পরই দেখলে, ছেলেটা পুকুরের জলে প'ড়ে

হাবুডুবু খাচ্ছে। রূপলাল ছুটে যাচ্ছিল তুলতে, কিন্তু দারোয়ানটা তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে কোথা কাছেই ছিল। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে রূপলাল পালিয়ে গেল, দেশ দেশান্তর কত জায়গা ঘুরে চ'লে গেল হিমালয়। আর দেখা হয় নি আমার সঙ্গে।

যুবক বলিল, দারোয়ান কেনে তুলবে? ছেলে ম'রে ভেসে উঠেছিল। কাত্তিক তখন খোকাকে ছেড়ে গাছের ছায়াতে একটা ছুঁড়ী ঝিয়ের সঙ্গে হাসি মস্করা করছিল।

প্রৌঢ় দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, ভাগ বেটা, তুই কিছুই জানিস না। কাত্তিক খুব ভাল ছেলে।

তরুণ এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, বাপ জিন্দে বেটা, কাত্তিক তখন উড়তে শিখেছে। ছুঁড়ী ঝিটার সঙ্গে তখন খুব মজে গিয়েছে।

প্রৌঢ় শাসন করিয়া উঠিল, অ্যাই!

যুবক গ্রাহ্য করিল না, হাসিল, তুমি জান না, এখন শোন। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল, মেয়েটা চ'লে গেলে কাত্তিক এসে খোকাকে খুঁজে না পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। বিকেলে ছেলে ভেসে উঠল জলে। গায়ে একখানি গয়না নাই। লোক বললে, কাত্তিকই জলে ডুবিয়ে মেরেছে গয়নার লোভে। পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল কাত্তিককে। কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। কথা শেষ করিয়া সে মদের বোতলটি টানিয়া লইল।

প্রৌঢ় বাঘের মত ঝাঁপ দিয়া বোতলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিয়া সেটাকে চূর্ণ করিয়া দিল। উগ্র সুরার গন্ধ ধুনির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বায়ুস্তর ভারী করিয়া তুলিল। যুবক অবাক হইয়া গিয়াছিল। প্রৌঢ় উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল, শালা, মদ খেতে এসেছ, গাঁজা খেতে এসেছ? নিকালো শালা। বেরোও বলছি।

যুবক অকারণে অতর্কিতে মার খাইয়া ভীষণ ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় তখন চিমটি লইয়া উঠিয়াছে। যুবক আর সাহস করিল না, নাটমন্দিরের বিষ-নিশ্বাস স্মরণ করিয়াও সে অন্ধকারে অন্ধকারে ভোগমন্দিরের দাওয়ায় গিয়া বসিল।

দুইজনেই স্তব্ধ। ধুনির অগ্নিশিখা নিবিয়া গিয়াছে, আর ফু' দেওয়া

হয় নাই। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ভস্মের আবরণ পড়িয়াছে। নিরন্ধ্র অন্ধকার। মৃদু ধারার বর্ষণ এখন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লির অবিরাম ধ্বনি—রাত্রির চরণের নূপুরধ্বনির মত বাজিতেছে, রাত্রি চলিতেছে। কেবল একটা পেঁচার অস্পষ্ট অথচ উচ্চ স্যাঁ—স—স্যাঁ—স শব্দ গুপ্ত অস্ত্রের মত অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রৌঢ় আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। আকাশ নাই, মেঘের অস্তিত্বও দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু অন্ধকার।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত বহিয়া চলিয়া ছিল, অরণ্যের বহু বিচিত্র ধ্বনি তেমনই ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। তৃতীয় প্রহর-শেষে আবার একবার ধ্বনি উচ্চ হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ পরেই ডাকিয়া উঠিল পাখী। ঘন মসীলিপ্ত আকাশেও আলোর দীপ্তি দেখা দিয়াছে। অরণ্যের মায়াপুরী স্তব্ধ হইয়া আসিল। এখন চারিদিক বেশ দেখা যায়।

যুবক সন্ন্যাসী দেখিল, প্রৌঢ়ের মুখে চোখে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, লোকটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, যেন আর কখনও কথা বলিবে না।

যুবক আপনার জিনিসপত্র গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইল, বলিল, যাবে না?

প্রৌঢ় স্তব্ধ হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল; কোনও উত্তর না পাইয়া যুবক পথে পা বাড়াইল। সহসা প্রৌঢ় ধরা গলায় ডাকিল, শোন।

কি?

কামিনীর খবর জানিস? কামিনী?

কার্ত্তিকের মা?

হ্যাঁ।

সে—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবক বলিল, ছেলের ফাঁসির হুকুম শুনে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

প্রৌঢ় অঘোরপন্থী দীর্ঘায়ু সাধু বোধ হয় সংবাদটা জানিত, কারণ সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল বিমূঢ়ের মত বার কয়েক সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বোধ হয় জানাইল, হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, মনে ছিল না, মনে পড়িয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, মা বেটা দুজনের ফাঁসি হয়ে গেল! আবার সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। রূপলালেরও ফাঁসি হবে।

যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে। কাত্তিকের ফাঁসি কেন হবে? জজ কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল, কিন্তু অল্প বয়েস ব'লে লাটসাহেব ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ফাঁসি হয় নাই?

না।

যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রৌঢ় সেই নির্ব্বোধ বিনীত হাসি হাসিল। তারপর সাদরে আহ্বান জানাইয়া বলিল, ব'স, গাঁজা খা। হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতী ভাতি শুতি, পেভাতে পেভাতী, ভাতের পর ভাতী, শোবার সময় শুতি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতীটা হয়ে যাক।

যুবক বসিল। গাঁজা তৈয়ারী করিয়া নিজে টানিয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, খা। কষিয়া টান মারিয়া যুবক দম ধরিয়া বসিল। কল্কেটি হাতে লইয়া প্রৌঢ় বলিল, দ্বীপান্তর সে কোথা বটে?

চোখ বিস্ফারিত করিয়া যুবক বলিল, আ—ন্দা—মান। সমুদ্দুরের ভেতর দ্বীপ। জাহাজে ক'রে যেতে হয়।

হ্যাঁ?

হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কল্কেতে টান দিল। যুবক এবার বলিল, আচ্ছা, রূপলাল হিমালয়ে আছে বলছিলে! তা—

প্রৌঢ় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, কোন গুহাতে-মুহাতে থাকে, কে জানে! হাজার হাজার গুহা তো সেখানে।

যুবক কল্কেতে আবার টান মারিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল। আর নাই। ঝুলির মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া প্রৌঢ় উঠিল, সঙ্গে যুবকও উঠিল।

বিদায়সম্ভাষণব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া যুবক বলিল, আচ্ছা।

প্রৌঢ়ও সেই নির্ব্বোধ হাসি হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। আচ্ছা।

দুইজনে দুই বিপরীত মুখে পথ ধরিল। যুবক উত্তর মুখে—উত্তর দিকে হিমালয়, প্রকাণ্ড পাহাড়, তাহাতে হাজার গুহা। দেড় শো বছর বয়সের অঘোরপন্থী বলিয়াছেন, হাজার হাজার গুহা সেখানে। তাহার মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মানুষ!

প্রৌঢ় চলিল দক্ষিণ মুখে—দক্ষিণ দিকে নাকি সমুদ্র। সেই সমুদ্রের

মধ্যে দ্বীপ আন্দামান। কূলে পোঁছিতে পারিলে দাঁড়াইয়া হয় তো দেখা যাইবে। নয় তো নৌকা-টৌকাও তো যায় আসে। অন্তত এ দিকের তীরে দাঁড়াইয়া ওপারের মানুষকেও তো দেখা যাইবে। কয়েদীর দলের মধ্যে ছোট একটি ছেলে।

চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা

চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা ইতিহাস নয়—কাহিনী। তাঁহার জীবনের যে ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার কথা বলিব, সেটি ঘটিয়াছিল উনিশ শ সাত সালে নভেম্বর মাসে, সতরই নভেম্বর। যাদবপুর অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয়ের মধ্যে চন্দ্রকান্ত সুরেন্দ্র গড়াঞীয়ের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল। আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মণ্ডপের আলোগুলি যেন নিবিয়া হইয়া গেল অন্ধকার। সুরু গড়াঞী 'বাপ রে' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

ম্যানেজার জামাইবাবুর বড় বড় উগ্র চোখ হইতে তখনও যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, একবার নয় দুবার নয়, অন্তত পাঁচশো বার ব'লে দিয়েছি—দেখিয়ে দিয়েছি যে, রাজা বলবে—ওরে, কে আছিস, আমার মালা আন্! একবারে যাবি না, দুবারে না, তিনবারের বার গিয়ে প্রথমেই নমস্কার করবি, তারপর মালাটি রাজার হাতে দিবি, তারপর আবার নমস্কার ক'রে চ'লে আসবি। আর ও বেটা কিনা নমস্কার ক'রে মালা নিজের গলায় প'রে চলে এল!

যাদবপুর অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয় হইতেছিল। সুরেন্দ্র গড়াঞী নির্ব্বাক পরিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া উপরোক্ত কাণ্ডটি করিয়া বসিল। তুলসীকাঠের জপমালাখানি রাজার হাতে দিবার কথা, কিন্তু বিপুল দর্শক-সমাবেশের দিকে চাহিয়া তাহার সব ভুল হইয়া গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া মালাখানি নিজের গলায় পরিয়া চলিয়া আসিল। আসিবামাত্র ওই চপেটাঘাত। থিয়েটার ক্লাবের ম্যানেজার—এই গ্রামের জামাই চন্দ্রবাবু একেই গরম মেজাজের মানুষ, তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আত্মসম্বরণ করা তাঁহার অভ্যাস নয়।

রহস্যময় রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে সাজঘর—সেখানে সুন্দরী তরুণী রাজবধূ ডাবা হুঁকায় তামাক খায়, অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক—চাঁচর কেশ চৈতন্য চক্ষু মুদিয়া মুরগীর ঠ্যাং চর্ব্বণ করে; ব্রিবিদ্যাসাধনকারী ক্রোধী বিশ্বামিত্র কোমর ঘুরাইয়া নাচে, সীতা সেখানে অতর্কিতে রাবণের মুখের সিগারেট

কাড়িয়া লইয়া কটাক্ষ হানিয়া দিব্য টানিতে টানিতে অশোক বনে রামের জন্য বিলাপ করিতে যায়, সেই অদ্ভুত দৃশ্যে বিচিত্র চাপা-কোলাহলমুখর সাজঘর এক মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত এবং স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া সুরেন্দ্রকে ধরিয়া তুলিলেন, ওঠ ওঠ সুরেন শুনছিস?

সুরেনের চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান হারায় নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, চোখ দিয়া তখন তাহার দর দর ধারে জল পড়িতেছে।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু তাহাকে ভাল জায়গায় বসাইয়া নিজেই এক কাপ চা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, খা।

আজ্ঞে না।

না নয়, খেতেই হবে তোকে। ওরে মিষ্টি আন। জলদি!

চায়ের কাপটি হাতে লইয়া সুরেন বলিল, না। আজ্ঞে না। লজ্জায় তাহার মাথা যেন কাটা যাইতেছিল।

চারিটা মিষ্টি চায়ের প্লেটে ফেলিয়া দিয়া সৌরেশবাবু বলিলেন, কি করব বল্। জানিস তো বাপু, জামাই আমাদের রাগী মানুষ; বিশেষ থিয়েটারের পার্ট ভুল করলে ওর আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। বলিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, আমাকে যে চড় মেরেছিল চন্দ্র, সে আমি আজও ভুলতে পারি নি। হরিশ্চন্দ্র প্লেতে চন্দ্র বিশ্বামিত্র, আমি অযোধ্যার মন্ত্রী, আমাদের খেলু সেনাপতি। আমাদের সীনের প্রথমেই বিশ্বামিত্র অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে বলছে, মন্ত্রী, আজ কি কি রাজকার্য্য আছে? মন্ত্রীর সে মস্ত পার্ট, লম্বা এক ফিরিস্তি দাখিল করবে। কিন্তু আমার তখন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে, সামনেই দেখি দাদা, কেষ্টদাদা, নীলুকাকা—যত মাতব্বর ব'সে র'য়েছে। প্রম্পটার বলছে, একবর্ণও বুঝতে পারছি না; আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম। চন্দ্র তখন ক্ষেপে উঠেছে, আবার বললে, আজ কি কি রাজকার্য্য আছে মন্ত্রী? আমি এক কথাতে চুকিয়ে দিলাম, আজ আর রাজকার্য্য কিছুই নেই। ব'লেই চন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রক্ত জল হয়ে গেল। খেলুকে বললাম, খেলু রাত হয়েছে—চল্ বাড়ি যাই, ভাত খাই গে। ব'লেই দে চম্পট। চম্পট মানে একেবারে স্টেজ ছেড়ে বাড়িমুখে। কিন্তু কাদা মাখলে কি যমে ছাড়ে! অন্ধকারে চমকে উঠলাম, পেছন থেকে তখন ক্যাঁক ক'রে এসে ধরেছে চন্দ্র।

একবারে ঘণ্টা দিয়ে ড্রপ ফেলে পিছনে পিছনে তেড়ে এসেছে। তারপর বুঝলে, দুটি গালে ক'ষে দুটি চড়! বাপ রে, বাপ রে, সে কি চড়!

ব্যাপারটা সত্যই অনেকটা লঘু হইয়া গেল! সৌরেশবাবু এখানকার জনপ্রিয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পুঁথিগত শিক্ষা না থাকিলেও সংস্কারে আভিজাত্য আছে। যাহার বলে, পুরানো তবলার মত সেকেলে সেতার-সারেঙ্গী হইতে আধুনিক পিয়ানো-পিকলুর সহিত সমানে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন। তিনি চন্দ্রবাবুর প্রহারটাকে এমন উপভোগ্য রহস্যের বস্তু করিয়া তুলিলেন যে, প্রহৃত সুরেনের মুখ পর্য্যন্ত সলজ্জ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাবতীয় অভিনেতার দলও হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মনে আর বিশেষ কোন গ্লানি ছিল না। কেষ্টচন্দ্র পাত্র নামহীন রাজা মন্ত্রী সেনাপতি এবং বড় বড় দূত অর্থাৎ রাজদূতের ভূমিকায় অভিনয় করে। সে বলিল, ওঃ, জামাইবাবুর আমাদের সূয্যির তেজ, লাটের খাতির করেন না উনি! কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা—যাঁহারা সমাজের সম্ভ্রান্ত, তাঁহারা সকলেই গম্ভীর হইয়াই রহিলেন।

নেপাল শী অভিনয় করে না, সীন টানে, ঈষৎ হেঁট হইয়া হাত জোড় করিয়া কথা বলা অভ্যাস; অভ্যাস মত ভঙ্গিতে সে বলিল, আমি একবার ভুল সীন ফেলেছিলাম, বাস্, স্টেজে ঢুকেই জামাইবাবু বেরিয়ে এসে এক লাঠি; বুড়োর পাঠ করছিলেন, হাতে লাঠি ছিল।

নেপালের কথা শেষ হইল না; স্টেজের উইংসের পাশে সমবেত অভিনেতা, প্রম্পটার, বান্ধব সকলেই চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল, হাঁ—হাঁ—হাঁ! ছিঁড়ল—ছিঁড়ল। গেল—গেল!

নেপাল ছুটিয়া গিয়া দেখিল, একটি 'ডিসকভার সীনে' দেবীর সম্মুখে ধ্যানমগ্ন আবক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত কাপালিকের বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু বন্দোবস্তের ভুলে সম্মুখের দৃশ্যপট ও পিছনের দৃশ্যপটের মধ্যে স্থান এত সংকীর্ণ হইয়াছিল যে, সম্মুখের দৃশ্যপট গুটাইয়া উঠিবার সময় কাপালিকের দীর্ঘ দাড়িখানিকেও গুটাইয়া লইয়া উপরে উঠিতেছে। দাড়ি যাইবার ভয়ে কাপালিক দৃশ্যপটের বাঁশটাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। উইংসের ফাঁকে দাঁড়াইয়া সকলে বলিতেছে, গেল—গেল! ছিঁড়ল—ছিঁড়ল।

কিন্তু সীনের দড়ি যাহারা টানিতেছে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কেবল বুঝিতেছে, দৃশ্যপটের বাঁশটি কিছুতে আটকাইয়াছে। তাহারাও

সজোরে টানিতেছে। অবশেষে এক হ্যাঁচকা টান; সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের হাত ছাড়াইয়া দাড়ি-সমেত সীন গুটাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কাপালিক পাকা লোক, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শকদের দিকে পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, দাড়ি—জলদি দাড়ি—কাঁচাপাকা!

দোষটা স্টেজ-ম্যানেজারের। কিন্তু সে বিচার তখন চলিতেছিল না, তখন সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। কেবল ম্যানেজার চন্দ্রজামাই মাথা হেঁট করিয়া রাগে ফুলিতেছিলেন। স্টেজ-ম্যানেজার এখানকার বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, অভিনেতা হিসাবে তিনি একজন রথী। সেক্রেটারি সৌরেশবাবু চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভাই চন্দ্র, তুমি একটু হাস, এমন মুখ গোমড়া ক'রে থেক না।

চন্দ্রজামাই কিছু বলিলেন না, উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পার্ট আছে। তাঁহার ভূমিকার শেষ দৃশ্য। উঠিয়া গিয়া তিনি উইংসের ফাঁকে দাঁড়াইলেন।

সৌরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয়ানক চ'টে গেছে। পর পর দুটো খুঁত! তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আলোচনাটা হইতেছিল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের দলের মধ্যে। ইন্দ্রচন্দ্র-স্থানীয় একজন বলিলেন, চটবারও কিন্তু একটা মাত্রা থাকা উচিত। ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।

সৌরেশবাবু হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, চুপ! তার পর আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন, চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন।

তাহাতেই বোধ করি বক্তার জেদ বাড়িয়া গেল, বলিলেন, আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি লুকিয়ে বলছি না। সুরু গড়াঞীকে চড় মারা অন্যায় হয়েছে। তা ছাড়া ওঁর ব্যবহারই ঐরকম! এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। না হ'লে কেউ আর পার্ট করবে না। লোকে আসে এখানে আনন্দ করতে, মার খেতে নয়, অপমানিত হতে নয়। আমি এ কথা ওর মুখের সামনেই বলব, থিয়েটারের পর মিটিংয়ে সকলের সামনে কথা তুলব আমি। আমি কেয়ার করব না। নিরীহ গরীবদের ওপর এ রীতিমত অত্যাচার। ওরা যদি উল্টে গায়ে হাত তোলে তো কি হয়?

অন্য একজন বলিলেন, এখনই হয়ে যাক না, ডাক না ওঁকে।

চন্দ্রজামাই তখন উইংসের ভিতর হইতে বক্তৃতা শুরু করিয়া স্টেজে প্রবেশ করিতেছেন। অভিনয় চন্দ্রজামাই ভালই করেন। উচ্চারণ আবৃত্তি সব

নিখুঁত নয়, বরং চীৎকারের মাত্রা একটু অতিরিক্তই, তবু এমন প্রাণ দিয়া অভিনয় করার শক্তি দুর্লভ। শেষ দৃশ্যে চন্দ্রজামাইয়ের প্রাণবন্ত অভিনয়ের গুণে দর্শকেরা অভিভূত হইয়া ঘন ঘন করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু বলিলেন, চন্দ্র কিন্তু পার্ট করে বাপু, চুটিয়ে। ভাল পার্ট করছে!

ওদিকে ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল, ড্রপ পড়িতেছে। চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইয়া গেল।

ইন্দ্রস্থানীয় সভ্যটি ঠোঁট বাঁকাইয়া দিয়া বলিলেন, যাত্রা! ওকে থিয়েটার বলে না।

চন্দ্রজামাই আসিয়া সাজঘরে প্রবেশ করিলেন; একে একে পরচুলা গোঁফ-দাড়ি সাজ-পোষাক খুলিয়া ড্রেসারকে বুঝাইয়া দিয়া আপনার জামা-আলোয়ান ছড়ি লইয়া সর্ব্বশেষে এককোণে রক্ষিত ঝকঝকে লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন, সৌরেশ!

সৌরেশ ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাধা দিতে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবে আশঙ্কায় তিনি নীরব ছিলেন। চন্দ্রজামাই ডাকিতেই তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ। আমি চললাম। শেষ অঙ্কটা একটু দেখে শুনে নিও, যেন গোলমাল না হয়, দুর্নাম না হয়!

সে কি? তুমি চললে কি রকম? আমি ভাবলাম, তুমি বাইরে-টাইরে—

না, বাড়ি চললাম। আমি রিজাইন দিলাম। আমাকে তোমরা এর পর থেকে বাদ দিও।

মানে? না—না—না, চন্দ্র—

বাধা দিয়া চন্দ্রজামাই বলিলেন, মানে আমার বাঙালে গোঁ।

হাসিয়া সৌরেশ বলিলেন, ওঃ ভারী বাঙাল, আমাদের বোনের কাছে তো কেঁচো।

চন্দ্রজামাইও হাসিলেন।

সৌরেশ বলিলেন, পাগলামি ক'র না। এস—এস। তুমি না হ'লে চলে?

জোড়হাত করিয়া চন্দ্রজামাই বলিলেন, জোড়হাত করছি আমি, সৌরেশ।

বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া হন হন করিয়া থিয়েটার স্টেজকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

সৌরেশ আর কিছু বলিলেন না। বেশ জানেন, চন্দ্রজামাই থিয়েটার ফেলিয়া থাকিতে পারিবে না। তবু মনটা তাঁহার খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

চন্দ্রকান্ত কুলীন সন্তান, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, উপাধি মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এখানে তিনি চন্দ্রজামাই এবং জামাইবাবু। গুরুজনে পরোক্ষে বলেন, চন্দ্রজামাই, সাক্ষাতে বলেন চন্দ্রবাবাজী। সাধারণে বলে, জামাইবাবু। এ গ্রামে জামাই অনেক আছেন, বিবাহ করিয়া এই গ্রামে বাস করিয়াছেনও অনেকে, কিন্তু জামাইবাবু বলিতে চন্দ্রকান্তকেই বুঝায়।

সাধারণতঃ ঘরজামাইয়েরা জামাইবাবু বলিলে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু চন্দ্রকান্তের কোনও ক্ষোভ নাই। কৌলীন্যের এই অধিকার ও মর্য্যাদাকে তিনি স্বীকার করেন, এ বিষয়ে অহঙ্কার এবং দাবী তাঁহার অকুণ্ঠিত।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স ছিল পনরো। তখন হইতেই তিনি এই গ্রামে বাস করিতেছেন এবং খাঁটি জামাইবাবুরূপেই বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে দীক্ষা তাঁহার পিতার নিকট। তাঁহার পিতার বিবাহ ছিল অনেকগুলি, সংখ্যায় কত তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও, হাত-পায়ের আঙুলের হিসাবের যে বহির্ভূত, তাহা নিঃসন্দেহ। বাল্যকালে মাতৃহীন চন্দ্র মাতুলালয়ে থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে বাপের সহিত তিনি অন্য মাতুলালয়ে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। পনরো বৎসর বয়সে তিনি নিজেই বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঊনিশ শ সাত সালেরও ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আঠার শ সাতাত্তর সালের ঘটনা, তখন কৌলীন্যের ঔজ্জ্বল্য মলিন হয় নাই, কিন্তু কয়েকটি অধিকার নিন্দিত হইয়া খর্ব্ব হইতে শুরু করিয়াছে, স্বৈরিণীর অঙ্গের হীরকের মত বহুবিবাহিত কুলীন পুত্রও নিন্দিত হইতেছে। চন্দ্রকান্ত সাধ্যমতে নিন্দার কাজ করিতেন না, তিনি এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এখানে বসবাস করিলেন। তাঁহার রীতিনীতিগুলি তখনকার দিনে পরম প্রশংসার বিষয় ছিল। ভোরে উঠিয়া ঝকঝকে মাজা গাড়ুটি হাতে করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্যে বাহির হইতেন; লোকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে গাড়ুটির দিকে চাহিয়া থাকিত—বহুভৃত্যের প্রভুর

বাড়িতেও পিতল কাঁসার বাসনে এমন উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা যায় না। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া অতি উচ্চ ও-য়া, ও-য়া শব্দে প্রভাতস্বপ্নাতুর পল্লী-বাসীদের জাগাইয়া তুলিয়া মুখ হাত ধোয়া শেষ করিতেন। গুরুজনে ছেলেদের বলিতেন—চন্দ্রজামাইকে গিয়ে দেখ! ওকে দেখে শেখ, কি আচার—কি তরিবৎ!

বাড়ি ফিরিয়া চকচকে সুপরিচ্ছন্ন রুপা-বাঁধানো হুঁকাটিতে পুরা এক ছিলিম তামাক খাইয়া চন্দ্রকান্ত পরিপাটি করিয়া জামাইয়ের উপযুক্ত ভব্যতার সহিত কাপড়খানি পরিয়া জামাটি গায়ে দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া জুতাটি পরিয়া ছড়ি হাতে বাহির হইতেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি ছড়ি ব্যবহার করেন। চন্দ্রজামাইয়ের তখন গ্রামে পরম সমাদর ছিল, বাংলা দেশের বহু স্থানের পরিচয় তাঁহার নখদর্পণে। এ ছাড়া তাস, পাশা, দাবায় তিনি সেই বয়সেই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটা লইয়াই এক নাগাড় দুই তিন মাস কাটিয়া যাইত; একাদিক্রমে তিন মাস কোনও এক আড্ডায় প্রত্যহ প্রাতে তাস খেলিয়াই তাঁহার কাটিয়া যাইত। হঠাৎ একদিন দেখা যাইত তাঁহাকে কোনও দাবার আড্ডায়। দুই মাস পর একদিন অপর কোনও পাশার আড্ডায় গিয়া উঠিতেন। আবার সম্ভ্রান্ত মজলিসে তিন চার মাস ধরিয়া নিয়মিত গল্পই করিতেন, তখন তাস, পাশা, দাবার কথায় বলিতেন—ওগুলো হ'ল অত্যন্ত পাজী নেশা। ওসব অল্প স্বল্পই ভাল। কিন্তু তিন চার মাস পরে একদা কোনও আড্ডায় আসিয়া প্রথমে খেলাটা একটু দাঁড়াইয়া দেখিতেন, তারপর তামাক খাইতে বসিতেন, এক সময় দেখা যাইত চন্দ্রকান্ত খেলায় প্রত্যক্ষভাবেই যোগদান করিয়াছেন। লোকে বলিত—খেয়াল। কিন্তু সে তাঁহার খেয়াল নয়, এক স্থানে যাইতে যাইতে সহসা একদিন তিনি অনুভব করিতেন যে, গৃহস্বামী এবং মজলিসের লোকদের ব্যবহারের মধ্যে অমর্যাদার কাঁটা বাহির হইতেছে, অবহেলার ভাব সুপরিস্ফুট। অমনই তিনি উঠিয়া চলিয়া আসিতেন। পরদিন ঘুরিতে ঘুরিতে অন্য একস্থানে গিয়া উঠিতেন।

বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরিয়া তিনি লণ্ঠনটি সাফ করিতে বসিতেন; দুই তিন বছরের পুরানো লণ্ঠন তাঁহার হাতে নূতনের মত ঝকমক করিত। লণ্ঠনের শিখাটি জ্বলিত সুগোল সুডৌল আকারে। তারপর স্নান, স্নান করিয়া নিজে কাপড়খানি সযত্নে কাচিয়া নিজে ঝাড়িয়া মেলিয়া দিতেন, নিজে তুলিতেন। তিন চার দিনের কাপড়ও মনে হইত সদ্য পাটভাঙা। প্রথম দিকে

শ্বশুরবাড়ির সকলে অনুযোগ করিতেন, হ্যাঁ বাবা, তোমাকে নাকি নিজের কাপড় কাচতে হয়?

তিনি কোনও উত্তর দিতেন না, কাপড় ছাড়িয়া দিতেন না; তাঁহার উগ্র চোখের দৃষ্টির সম্মুখে আর কেহ কোনও কথা বলিতেও সাহস করিতেন না। স্ত্রী অনুযোগ করিলে হাসিতেন, বলিতেন, এ আমার বাবার উপদেশ।

কাপড়খানি মেলিয়া দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিতেন, জান, ঘি পিঁড়ে সরু চাল—ঘরজামাইয়ের পক্ষে এগুলো যেমন বারণ এগুলোও তেমনই বারণ। আর ছড়ির জন্যে বল, বুড়োর মতন ছড়ি কেন? বিনা ছড়িতে শ্বশুরবাড়ি আমাদের ঢোকা নিষেধ। এ ছড়িটা আমার ঠাকুরদাদার ছড়ি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত নিদ্রা; জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত হুইল ছিপ হাতে বাহির হইতেন। তাঁহার ন্যায় মৎস্যাশিকারী এ অঞ্চলে বিরল। কিন্তু মালিক না বলিলে কখনও কাহারও পুকুরে ছিপ ফেলেন না; বেশির ভাগই তিনি শ্বশুরদের সুবৃহৎ সাজার দীঘিতে দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একদৃষ্টে ফাতনার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন. মাথায় থাকিত একখানি ভিজা গামছা। দীঘিটা প্রকাণ্ড এবং এ দীঘির মাছও নাকি প্রকাণ্ড, কিন্তু টাকপড়া মাথার দু চারগাছি দীর্ঘ চুলের মত সংখ্যায় বিরল। চন্দ্রজামাই বলিতেন, মারি তো গণ্ডার।

বৎসরে দুই একটা গণ্ডার তিনি মারিতেন। স্ত্রী মাঝে মাঝে বলিতেন, মিছিমিছি কেন দীঘিতে যাও বল তো? ভাল পুকুর দেখে বসলেও তো হয়।

চন্দ্রকান্ত বলিতেন, রাম! পরের পুকুরে কোথায় যাব?

মধ্যে মধ্যে তিনি পরের পুকুরেও যান; যাইবার পূর্ব্বে পুকুরের মালিকের ওখানে গিয়া বসিয়া পাঁচটা গল্প করিতে করিতে বলেন. খুব বড় বড় মাছ করেছ শুনলাম?

মালিক বলে, তেমন আর কি! তবে হ্যাঁ, পাঁচ সাত সের, বার চোদ্দ সেরও আছে কিছু।

চন্দ্রজামাই আর কিছু বলেন না। মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলে, তা ধরুন না একদিন।

চন্দ্রজামাই সে দিন সরঞ্জাম করিয়া বাহির হন। ছোট মাছ তিনি মারেন না।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া মুখ হাত ধুইয়া লণ্ঠন হাতে তিনি আবার বাহির হন। মাছ পাইলে সে দিন বাহির হইতে বিলম্ব হয়, স্ত্রী মাছ কোটেন, চন্দ্রজামাই দাঁড়াইয়া খানার আকার কিরূপ হইবে উপদেশ দেন, কাহাকে কয়খানা পাঠাইতে হইবে পাঠাইয়া দেন; কিরূপ রান্না হইবে সে উপদেশও দেন। মাছ না পাইলে—এবং সেইটাই বেশি—তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হন।

স্ত্রী বরাবর এক প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, ভালও তো লাগে তোমার?

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলেন, বেশ কেটে যায়।

চন্দ্রকান্তের স্ত্রী বড় ভাল মেয়ে, সরল শান্ত; কথার গূঢ় অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না। হাসিয়া চন্দ্রকান্ত লণ্ঠন ও ছাড়িটি হাতে বাহির হইয়া যান। সন্ধ্যায় গান-বাজনার আসর। সুকণ্ঠ না হইলেও চন্দ্রকান্তের কণ্ঠস্বর ভাল, সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও তাঁহার দখল আছে; তাস, পাশা, দাবার মতই এক একটা আসরে এক-এক সময় নিয়মিত যান আসেন।

চাকরি করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ও তাঁহার ধাতে সয় না। সামান্য খুঁটিনাটিতেই তিনি চাকরিতে জবাব দিয়া দিয়াছেন। কয়েকবারের পর তাঁহাকেও আর কেহ ডাকে না, তিনিও কর্ম্মখালির সংবাদে পা বাহির করেন না।

এ সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ঊনিশ শ পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশপ্রেমে অন্য সমস্ত স্থান ডুবুডুবু হইলেও যাদবপুর একেবারে ভাসিয়া গেল। গঠিত হইল 'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'; তখন থিয়েটারের বাংলা—নাটুকেদল, নাট্য সম্প্রদায়, নিকেতন ইত্যাদি ভাল কথাগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই। ড্রপে ছবি আঁকানো হইল ভারতমাতা চোগা-চাপকানপরিহিত হিন্দু এবং ফেজপরিহিত মুসলমানের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে লেখা হইল—হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। গ্রামের যুবকেরা প্রতাপাদিত্যের মহলা আরম্ভ করিয়া দিল। চন্দ্রজামাইও একেবারে যুদ্ধবাদ্যে নর্ত্তনরত যুদ্ধাশ্বের মত আসিয়া যোগ দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে পনরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজের মাতুলালয়

মুরশিদাবাদে সখের থিয়েটারে ছেলেবেলা হইতেই নারী-ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এবার তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি সূর্য্যকান্ত এবং হরিশ্চন্দ্রে বিশ্বামিত্রের ভূমিকা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। আটাশ বৎসর বিবাহিত জীবনের ঘড়ির কাঁটার মত কর্ম্মপদ্ধতিগুলি সব বদল হইয়া গেল। চন্দ্রজামাই এমনই একটা কিছু যেন চাহিতেছিলেন। সকালে উঠিয়াই পড়ুয়া ছেলের মত বই কাগজ কলম লইয়া তিনি বসিতে আরম্ভ করিলেন। সুন্দর হাতের লেখা; বানান দুই একটা অবশ্য ভুল থাকে, কিন্তু কোনও কথাটি বাদ যায় না, মুক্তার মত হরফে পার্ট লিখিয়া যান। মোটা একখানি বাঁধানো খাতায় সুন্দর করিয়া কাগজ ভাঁজিয়া মোটা হরফে লেখেন "শ্রীশ্রীপূজা—উপলক্ষে বন্দেমাতরম্ থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত প্রতাপাদিত্য বা বঙ্গের শেষ বীর।" তারপর ভূমিকালিপি এবং পাশে পাশে অভিনেতাদের নাম। শেষে এক নম্বর দূত দশ পৃষ্ঠা হইতে পঁচিশ নম্বর মৃত সৈনিক দুশ পঁচিশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রত্যেক ভূমিকা ও অভিনেতার নাম তিনি লিখিয়া রাখেন। একবার অভিনয় শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে পরের বারের বই নির্ব্বাচিত হইয়া যায়; সেক্রেটারি সৌরেশবাবু বই আনাইয়া চন্দ্র-জামাইকে পাঠাইয়া দেন; চন্দ্রজামাই খাতায় লেখেন—উপলক্ষে—বন্দে মাতরম্ থিয়েটার—ইত্যাদি। নীচে কমিটি-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা বিতরণ অনুযায়ী নকল করিয়া যান। তারপর তিনি দূত সৈনিক চর অনুচরে নম্বর বসাইয়া পৃষ্ঠা-চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করিয়া খাতায় লেখেন এবং পাড়ায় পাড়ায় এগুলিকে সংগ্রহ করিতে বাহির হন। কাহার কোন্ সুদর্শন ছেলেটি লেখাপড়া ছাড়িল, তাহার সন্ধান মাস্টারদের পূর্ব্বেই রাখেন। মাস্টার হয় তো খাতায় তাহার নামের পাশে তখনও অনুপস্থিত-চিহ্ন দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু চন্দ্রজামাইয়ের খাতায় তাহার নাম এবং হাজিরা ততক্ষণে লেখা হইয়া গিয়াছে। প্রতি অপরাহ্ণে নিয়মিত জামাইবাবু আসিয়া ডাকেন, খুদীরাম, খুদীরাম!

ডবল সিঁথি চিরিয়া টেরিকাটা সুন্দর খুদীরাম বাহির হইয়া আসে, জামাইবাবু বলেন, যেয়ো যেন সন্ধ্যার সময়।

রাত্রে প্রয়োজন হইলে ঝকঝকে লণ্ঠন হাতে খুদীরামের দুয়ার পর্য্যন্ত তাহাকে তিনি পোঁছাইয়া দিয়া যান। প্রায়-অন্ধ দুকড়ি চক্রবর্ত্তী ভাল পার্ট করে, তাহাকেও পোঁছাইয়া দেন নিয়মিত।

দিস্তাখানেক কাগজ লিখিয়া পার্ট নকল শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন সৌরেশ আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন, চন্দ্র, চন্দ্র!

কি খবর? কি খবর? মাছের চার তৈয়ারি করিতে করিতেই চন্দ্রজামাই বাহির হইয়া আসেন।

এই চিঠি দেখ ভাই। ও বইটা হ'ল না।

হ'ল না?

না। এই দেখ বিমল চিঠি লিখেছে, কলকাতার কারু মত হচ্ছে না ও বইয়ে; নতুন বই খুলেছে, সেই বই হবে।

হুঁ। চন্দ্র কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন; তারপর সেই চার হাতেই খাতাপত্র-গুলি আনিয়া সৌরেশের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলেন, এই নাও।

পিছাইয়া গিয়া সৌরেশ বলেন, ও নিয়ে আমি কি করব?

আমি আর পারব না হে! চন্দ্রকান্ত গর্জ্জন করিয়া উঠেন। সৌরেশ হাসেন।

চন্দ্রকান্ত বলেন, এই দেখ হেসো না বলছি! আমি কারও চাকর নই।

সৌরেশ কোনও কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সরিয়া পড়েন। অন্যথায় চড় খাইবার আশঙ্কা আছে।

দুই-তিনদিন অথবা সপ্তাহখানেক ধরিয়া আবার আরম্ভ হয় চন্দ্রজামাইয়ের পূর্ব্ব জীবন; তাস, পাশা অথবা দাবার আড্ডায় আবার তাঁহাকে দেখা যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরই তিনি নিজেই সৌরেশের ওখানে গিয়া ডাকেন, সৌরেশ।

সৌরেশ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, এস এস, আজই ভাবছিলাম তোমার কাছে যাব।

চন্দ্র প্রশ্ন করেন, বই এল?

এই নাও। বলিয়া সৌরেশ বই ফেলিয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ভূমিকাগুলির বণ্টন-লিপি। একবার দেখিয়া শুনিয়া বই হাতে তিনি উঠিয়া যান। পরদিন সকালে মোটা বাঁধানো খাতাটা খুলিবার পূর্ব্বের পৃষ্ঠার কোণে লেখেন—পোস্টপণ্ড—'Postpond'। অনেকবার তাঁহাকে লোকে বানানটার ভুলের কথা বলিয়াছে, কিন্তু তিনি ঐ বানানই লেখেন, বলেন, ওতেই আমার দিন চ'লে যাবে।

তারপর আবার লেখেন—উপলক্ষে ইত্যাদি। আবার পাড়ায় পাড়ায় বাহির

হন সংবাদ দিতে। আবার দিস্তা পরিমাণ কাগজে লিখিয়া চলেন পার্টের পর পার্ট।

ক্রমে একদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে থিয়েটার দেখাইবার উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার' নাম মুছিয়া লেখা হইল 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার'; ছবির নীচেকার লেখা বাণী মুছিয়া দেওয়া হইল। ওই ছবির নীচে কি লেখা হইবে ভাবিয়া না পাইয়া জায়গাটা খালিই রাখা হইল। সাহেব আসার গোলমালে অতিপরিচিত "একা প্রাণ কয়জনারে" গানটাও মনে পড়িল না। চন্দ্রজামাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; তিনি মহা উৎসাহে সকাল হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত অবিরাম খাটিয়া ফিরিলেন। প্রথম দিন বেশ অভিনয় হইয়া দ্বিতীয় রাত্রে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল! চন্দ্রজামাই থিয়েটার ভাঙিবার পূর্বেই বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। বাড়ি বন্ধ ছিল, সকলেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন। চন্দ্রজামাই দরজার পাশেই বাঁধানো দাওয়াটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন থিয়েটার উপলক্ষে প্রীতিভোজন। পুরাতন বন্দেমাতরম্ থিয়েটারের এটি বরাদ্দ ছিল, নূতন অন্নপূর্ণা থিয়েটারেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। ইহার মধ্যেও চন্দ্রজামাইয়ের বিশেষ একটি অংশ ছিল। তিনি মাংস রান্না করিতেন। সকালে উঠিয়াই কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই আসিবে; কিন্তু তিনি কি করিয়া সেখানে যাইবেন? ছি! না-গেলেও কেলেঙ্কারির সীমা থাকিবে না! লোকের পর লোক, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি! শ্বশুরবাড়িও আজ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। গত রাত্রির ঘটনায় যে অমর্যাদা তাঁহার হইয়াছে, সে সেই শ্বশুরের গ্রামের লোকের দ্বারাই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল—আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে বলে না, হ্যাঁ বাবা তোমাকে নাকি নিজে হাতে কাপড় কাচতে হয়!

ছড়িটি হাতে করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন—থিয়েটারের প্রধান-শিফ্‌টার স্বর্ণকার নেপাল শীয়ের দোকানে আসিয়া ডাকিলেন, নেপাল!

জামাইবাবু? সন্ত্রস্ত হইয়া নেপাল আসিয়া মোড়া পাতিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ফিরাইয়া তাঁহার হাতে দিয়া নেপাল বলিল, কাল রাত্রে—

কালকের কথা থাক নেপাল। ও আমি চুকিয়ে দিয়েছি।

ওরে বাপ রে! তাই কি হয় জামাইবাবু?

কঠিন দৃষ্টিতে চন্দ্রজামাই নেপালের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, তোর এখানে আসা আমার অপরাধ হয়েছে। তিনি উঠিলেন। নেপাল জোড়হাত করিয়া বলিল, হেই জামাইবাবু, দোহাই আপনার!

নেপালের চোখ সত্যই ছল ছল করিতেছিল, চন্দ্রবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ তামাক খাইয়া আঙুল হইতে আংটিটি খুলিয়া বলিলেন, দেখ্‌তো রে, কি ওজন আছে?

নেপাল ওজন করিয়া দেখিল। জামাইবাবু বলিলেন, গোটা দশেক টাকা হবে?

নেপাল মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, বেশি হবে আজ্ঞে। চোদ্দ টাকা সাত আনা হচ্ছে।

নিতে পারবি তুই?

আজ্ঞে? আর প্রশ্ন করিতে নেপালের সাহস হইল না।

টাকা কিন্তু আমার এখনি চাই। আজই চারটের ট্রেন ধরতে হবে আমাকে।

কোথায় যাবেন? কই, কিছু তো—। নেপাল সভয়ে চুপ করিল। হাসিয়া চন্দ্রজামাই বলিলেন, অনেক জায়গা যেতে হবে রে। মামারা অনেক দিন থেকে লিখছেন। সেখানে একটা বাড়িও আমার আছে, মাতামহ দিয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া কলকাতাও একবার যাব। সৎ-ভাই আছে, অনেকদিন তাকে দেখি নি। এখানে থেকে আপনার জনকে যে আর মনেই পড়ে না রে!

বাড়িতে বলিলেন, জরুরী কাজ। চিঠি আসিয়াছে।

চিঠি যে কেহ দেখিতে চাহিবে না, সে তিনি জানিতেন। যে চাহিবে, সে পড়িতে জানে না। যে কোনও চিঠি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেই চলিবে। শুনাইলেনও তাই।

"তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমার ঘরখানির কোনও ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।"

বাড়িতেই গরুর গাড়ি ছিল, আট মাইল দূরে স্টেশন। বেলা বারোটায়

ছইয়ের ভিতর হইতে বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া চন্দ্রকান্ত চলিয়াছিলেন। খানিকটা যাইতেই দেখা হইল সম্বন্ধী-স্থানীয় বনবিহারীর সঙ্গে, সে প্রশ্ন করিল, ওই, জামাই কোথা যাবে গো?

হাসিয়া জামাই বলিলেন, চিরকালই কি তোমাদের গোয়ালে বাঁধা থাকব হে? তারপর বলিলেন, মুরশিদাবাদ যাচ্ছি ভাই।

কি বিপদ, গয়ারাম ঘোষাল দাঁড়াইয়া! গয়ারামও প্রশ্ন করিল, আপনি আবার কোথায় গো?

গম্ভীরভাবে চন্দ্রজামাই বলিলেন, লাহোর।

গাড়িটা আসিয়া বাজারে পড়িল। দুই পাশে পরিচিত দোকানদারের দল। ইহারা বড় খাতির করে জামাইবাবুকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার দূত অনুচর এবং সেনাবাহিনীর অন্তর্গত। সকলেই উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু, কোথায় যাবেন?

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, চললাম বাপু দিন-কতকের জন্যে।

কবে ফিরবেন?

কি ক'রে বলছি বল? এখুনি কি হবে, কেউ বলতে পারে?

জামাইবাবুর রসিকতা ভাবিয়া তাহারা হাসিতে লাগিল।

দুকড়ি চোখে ভাল দেখিতে পায় না, একরূপ অন্ধই; কিন্তু থিয়েটারে তাহার গভীর অনুরাগ; চেহারাও ভাল, পার্টও সে করে চমৎকার। শুনিয়া শুনিয়া সে ভূমিকা আয়ত্ত করে; সে তাঁহার নিজের হাতে গড়া অভিনেতা। নিত্য নিয়মিত তাহার হাত ধরিয়া বাড়ি আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। দুকড়ি বাড়ির বাহিরে বসিয়াছিল, কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য দেখিতে পায় নাই; তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, দুকড়ি, আমি চললাম যে!

কে, জামাইবাবু? দুকড়ির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হ্যাঁ। একটু মুরশিদাবাদ যাচ্ছি।

দেখা হইল না কেবল সুরু গড়াঞীয়ের সঙ্গে। একভাবে অনেকক্ষণ থাকিয়া অস্বস্তি বোধ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একবার ভাল করিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়টুকুর মধ্যেই সুরুর দোকান পার হইয়া গিয়াছে। ইহার পরই স্কুল, ডাক্তারখানা, থিয়েটারের স্টেজ। চন্দ্রজামাই ইচ্ছা করিয়াই আত্মগোপন করিয়া শুইয়া পড়িলেন। মাস্টারের দলটিকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। উহাদের দৃষ্টির মধ্যে একটা অবহেলা আছে।

তা ছাড়া স্টেজের সম্মুখে এখন জটলা চলিতেছে—কে কেমন অভিনয় করিয়াছে তাহারই আলোচনা।

মন্থর গমনে গাড়িটা চলিয়াছিল। গাড়ির মধ্যে চন্দ্রজামাই নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়াছিলেন। চারটে প'য়তাল্লিশ মিনিটে ট্রেন। এখন? কারে বাঁধা রুপার কুরভাইজার ঘড়িটা বাহির করিয়া ডালা খুলিয়া দেখিলেন—বারোটা কুড়ি। এখনও পুরো চার ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। ঘণ্টায় দুই মাইল গেলেও পঁচিশ মিনিট সময় থাকিবে। কিন্তু দুই মাইলের বেশীই যাইবে ঘণ্টায়। ট্রেনটা নলহাটি পৌঁছিবে সাড়ে আটটায়। ওখান হইতে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন কখন ছাড়িবে জানা নাই, তবে একটার এদিকে নয়। ভরসার মধ্যে ট্রেনখানা দাঁড়াইয়া থাকে, শুইতে পাওয়া যাইবে। ভোরবেলায় খাগড়াঘাট, তারপর ফেরি নৌকা। ওখান হইতে শেয়ারে একখানা গাড়ি। চারি আনাই যথেষ্ট। মামাদের ওখানে পৌঁছিতে বেলা আটটা।

চন্দ্রজামাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মাতামহ নাই; মামাও গত হইয়াছেন; মামী আছেন, অনেক বৃদ্ধা হইয়াছেন। জিহ্বা এবং কণ্ঠ এখনও তেমনই সবল আছে কি না কে জানে। প্রণাম করিলেই তিনি বলিবেন, কি মনে ক'রে গো? ঘরের দখল রাখতে নাকি? মধ্যে একবার চন্দ্রকান্ত গেলে তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মাতামহ কোনও বাড়ি তাঁহাকে দিয়া যান নাই; দিয়া গিয়াছেন একখানি ঘর।

মামাতো ভাইরা বলিবে, তাইতো! একটা খবর দিয়ে তো আসতে হয়! ঘরটায় এখন—এ শুচ্ছে! আর হঠাৎই বা এলে কেন?

চন্দ্রজামাই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওরে ফ্যালা! একবার দাঁড়া তো!

গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি একটা গাছতলায় বসিলেন। বলিলেন, দাঁড়া বাবা, গাড়ির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। এখনও অনেক দেরি আছে। গরু দুটোকে দুটো খড় দে।

কলিকাতায় গেলে কি হয়? ভাইয়ের কাছে। ভ্রাতৃ-বধূটির রসনা ক্ষুরধার! তবে কোথায় যাইবেন? কোথায় তাঁহার স্থান? সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিল—শ্বশুরবাড়ির কথা।

না-না-না। পাগলের মত ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া মনে মনে তিনি উচ্চারণ করিলেন, না—না—না। আজ তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছেন—

সেখানে মানুষের মর্য্যাদাও আর কেহ তাঁহাকে দেয় না। যাহারা দেয় তাহারাও তাঁহারই মত অমর্য্যাদার পাত্র। ওই নেপাল শী, কেষ্টচন্দ্র পাত্র, দুকড়ি চক্রবর্ত্তী, খুদিরাম সাহা, ওই সুরেন্দ্র গড়াঞী।

নাঃ, লোকটাকে মারা উচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি তো তাহাকে অপমান করিবার জন্য মারেন নাই! সে ভুল করিল কেন? এত করিয়া শিখাইয়া শেষে মালাটা নিজের গলায় পরিয়া ফিরিল! ইস্, কি খুঁতটাই করিয়া দিল! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি শূন্যমনে চাহিয়া রহিলেন।

থাকিতে থাকিতে আবার মূল চিন্তাটা তাঁহার মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কেন? এ অবহেলা অমর্য্যাদা কেন? অশিক্ষিত বলিয়া? অশিক্ষিত তো অনেকে আছে। তবে তাহারা ধনীর সন্তান। বেকার বলিয়া? বেকারও তো অনেকে। তাহারা পৈতৃক অন্নপুষ্ট এইমাত্র। তবে তো একমাত্র অপরাধ ঘরজামাই বলিয়াই? কিন্তু তাহাতে তাঁহার অপরাধ কি? তিনি যখন ঘরজামাই হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তো পরম সমাদর করিয়াছিল ইহারা। শুধু ইহারা কেন? গোটা বাংলা দেশময় সম্মান ছিল। বহুবিবাহের নিন্দা তখন হইয়াছিল; সে তো তিনি করেন নাই! তবে? এখন ঘরজামাইয়ের যুগ গিয়াছে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আজ তাঁহার আপনার জন পর হইয়া গিয়াছে, পোষা মানুষের মত বসিয়া বসিয়া খাইয়া কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, আজ তিনি কি করিবেন?

ফ্যালা ডাকিল, জামাইবাবু!

অ্যাঁ?

ট্যানের দের হয়ে যেছে গো!

হ্যাঁ।

আবার তিনি গাড়িতে উঠিলেন। বিস্তীর্ণ পৃথিবীতেও কি তাঁহার স্থান হইবে না! কিন্তু কোথায়? গাড়ি মন্থর গমনে চলিল। ফ্যালা গরু দুইটাকে তাড়া দিল—অ'-ই অ'-ই!

নেপাল!

পরদিন প্রভাতেই নেপাল দেখিল জামাইবাবু। স্মিত-বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু?

ট্রেন ফেল হয়ে গেল। আবার ট্রেন আজ বিকেলে, চব্বিশ ঘণ্টা কি বসে থাকা যায়?

বাবাঃ! পরক্ষণেই নেপাল চিন্তিত হইয়া বলিল, আবার আজ সেই আট মাইল—ওই এক বিপদ হয়েছে।

নাঃ। কিছুদিন পরেই যাব। তামাক সাজ দেখি।

নেপাল তামাক সাজিতে বসিল। চন্দ্রজামাই আবার বলিলেন, আর ভেবে দেখলাম কি জানিস, গিয়েই বা করব কি? ঘর ভাঙছেন মা-গঙ্গা। সে কি রোখবার ক্ষমতা মানুষের? টাকা ক'টাই বাজে খরচ।

নেপাল হুঁকা হাতে দিল। চন্দ্রবাবু বলিলেন, সুরুকে একবার ডাকবি তো নেপাল।

নেপাল এতক্ষণে বলিল, সুরু বড় দুঃখু করছিল জামাইবাবু; বলে, আমার জন্যে জামাইবাবু—! অথচ সুরু কিছু মনে করে নাই। নিজেই বললে, মাস্টারে ছেলেকে মারে না!

তুই একবার ডাকবি তাকে? তোর এইখানে?

ডাকব। বাবুরাও আপনার কাছে—

বাধা দিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন, থাক নেপাল।

পরদিন সুরু গড়াঞ্চী আসিলে তিনি বলিতে কিছুই পারিলেন না, জামাই-মর্য্যাদায় বাধিল, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সুরু তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিল।

জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত, তিন মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, নেপালের ওখানেই তাঁহার সকাল সন্ধ্যা কাটিয়াছে।

চন্দ্রজামাইয়ের থিয়েটার-জীবনের কথা এইখানেই গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনকথার আরও খানিকটা আছে। উপরের অংশটুকু আমি লিখিয়াছিলাম, অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত চন্দ্রকান্ত স্মৃতি-সভায় পড়িবার জন্য। চন্দ্রজামাইয়ের জীবনের বাকিটুকু পাঠের সেখানে অধিকার ছিল না। কারণ বন্দেমাতরম থিয়েটারের সমাধিমন্দির অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবে রাজনৈতিক কোনও কিছু প্রবেশের অধিকার নাই।

চন্দ্রজামাই শেষকালে অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়াছিলেন। সেদিনের কথা এখন আমার মনে আছে।

পুলিসে জনকয়েক ভলোণ্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করিলে কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে আমি তাহাদের মালা পরাইয়া বিদায় দিতে গিয়া আপশোষ করিয়া ফিরিলাম—আমি কেন গ্রেপ্তার হইলাম না! গ্রামের নরনারী ভাঙিয়া আসিল—ফুলের মালা, খই, শাঁখ, বাকি কিছু রহিল না। বেকার যুবক কয়টির জয়ধ্বনি একেবারে আকাশ স্পর্শ করিল।

পরদিন চন্দ্রজামাই কংগ্রেস-কমিটির আপিসে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, একবার এলাম তোমার কাছে।

চন্দ্রজামাই আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম, বলুন।

আমি তোমাদের কাজে যোগ দিতে চাই।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, এই বয়সে—

হাসিয়া চন্দ্রজামাই প্রশ্ন করিলেন, যুদ্ধের মত বয়সের কোনও নিয়ম আছে নাকি তোমাদের?

না। তবে—

তবে আর আপত্তি ক'র না শিবু।

অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু কোনও মতেই শুনিলেন না চন্দ্রজামাই। অবশেষে একদিন তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। আমি তাঁহার পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম। আমি চোখে দেখি নাই, তবে নেপাল হইতে ভদ্র সমাজ পর্য্যন্ত সকলেই যে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। জেলগেটে যখন তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তখন তাঁহার মুখে স্মিত হাসি, গলায় ফুলের মালার বোঝা। উঁচু মাথায় তিনি জেলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সে মুখের ছবি জীবনে ভুলিব না। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, বন্দে মাতরম্।

তাহার পর জেলে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সে কথা ঘটনায় পরিণত কাহিনী নয়।

জেল হইতে বাহির হইয়াই চন্দ্রজামাই মারা যান।

অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত স্মৃতিসভায় কিন্তু চন্দ্র-জামাইয়ের জীবনকথা আমার পড়া হয় নাই। সভায় সংক্ষেপে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নাট্য-সাহিত্যে হাস্যরসের একটা জোর আলোচনায় সভা জমিয়া উঠিয়াছিল।

সুখনীড়

গোলাকার কক্ষপথে পৃথিবী চক্রাকারে একটি নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে, দিনের পর পৃথিবীর বুকে আসে রাত্রি, গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, মোট কথা একটি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা সেখানে বিরাজমান; আকস্মিকতার স্থান সেখানে নাই। কিন্তু পৃথিবীর বুকের মধ্যে আর একটি চক্র অহরহ আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহার গতি যেমন অনির্দ্দিষ্ট, আকস্মিকতার সংস্থান তাহার মধ্যে তেমনই অভিনব। এই আকস্মিকতার আঘাত যেমন প্রচণ্ড, বৈচিত্র্যও তেমনই প্রচুর। এ চক্র মানুষের ভাগ্যচক্র। আঙ্কিক নিয়মে এ চক্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত নয়।

নতুবা সনকা ও মণিমালার চারি বৎসরের মধ্যেই দেখা হইবার কথা নয় এবং হিসাব নিকাশ অনুযায়ী কলিকাতাও দেখা হইবার স্থান হইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতার এক রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে তাহাদের উভয়ের দেখা হইয়া গেল। সনকা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল পৃথিবীর পূর্ব্ব দিগন্ত লক্ষ্য করিয়া আর মণিমালা চলিয়াছিল পশ্চিমমুখে। সনকার স্বামী রেঙ্গুনে ব্যবসা করিতেন--বিবাহের পরই সনকা স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুন চলিয়া গেল। সনকা সেদিন মণিমালার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, আর জীবনে হয় ত দেখা হবে না বকুল।

মণিমালাও অঝোর ঝরে কাঁদিয়াছিল।

সনকার বিবাহের মাস আষ্টেক পর মণি যাত্রা আরম্ভ করিল। তাহার স্বামী তখন সদ্য লাহোর কলেজে অধ্যাপকের পদ পাইয়াছেন। বিবাহের তিন দিন পরই তিনি মণিমালাকে সঙ্গে লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মণিমালা সেদিন সনকার মাকে প্রণাম করিবার সময় সনকার জন্য কাঁদিয়াছিল, বলিয়াছিল, আর বোধ হয় বকুলের সঙ্গে দেখা হবে না।

কাঁদিবার যে কথা। তিন বৎসর বয়সে তাহারা 'বকুল' পাতাইয়াছিল। তাহার পর প্রতিদিন উদয়াস্ত কাল তাহারা দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, আড়ি করিয়াছে, ভাব করিয়াছে—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত

জল্পনা কল্পনা করিয়াছে, জীবনে বিচ্ছেদ হইলে দুইজনেই 'জল বিনা মীনে'র মত বাঁচিবে না, এমন কথাও বলিয়াছে।

বাংলার অত্যন্ত সাধারণ এক পল্লীগ্রামে পাশাপাশি বাড়ির মেয়ে দুই বাড়ির সম্মুখের খোলা জায়গার উপর যে বকুলগাছটি আছে, তাহার তলে আসিয়া খেলাঘর পাতিত। কোন দিন হইত মা ও মেয়ে, কোনদিন হইত শাশুড়ী ও বউ, কোন দিন হইত বর ও কনে। কোন দিন বা পরস্পরকে মারিয়া ধরিয়া দুইজনে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি ফিরিত। একদিন দুইজনেরই জননীদ্বয় একই মুহূর্ত্তে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আপন আপন মেয়েকে খাওয়ার সময় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। মেয়ে দুইটি সেদিন সাজিয়াছিল বড় বউ আর ছোট বউ, দুইজনেই আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল।

দুই জননীই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে তোমার?

ও বল বউ।

ও খোত বউ।

অকস্মাৎ দুই জননীর মধ্যে একজনের মাথায় কি খেলিয়া গেল, তিনি আপন মেয়েকে বলিলেন, না, তুমি ওকে বলবে বকুল, বকুলতলায় তোমাদের দুজনের ভাব—তোমরা দুজনে দুজনের বকুল।

অপর জননী সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, বেশ বলেছ ভাই! ভারী সুন্দর হবে। সনকা—বল—মণিকে বল বকুল।

সনকা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—উঁ?

মণি তোমার বকুল হয়, বল তো—বকুল!

বকুল!

মণিকে আর শিখাইয়া দিতে হইল না, সনকার শিক্ষা হইতেই তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল, সেও বলিল, বকুল!

সন্ধ্যায় মণিদের বাড়ির ঝি থালায় মিষ্টান্ন, রঙিন কাপড় এবং বকুলফুলের মালা লইয়া সনকাদের বাড়ি তত্ত্ব লইয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালেই মণিদের বাড়ি মণির বকুলের তত্ত্ব আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। তারপর নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে দুটি সখি ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কৈশোরের

প্রারম্ভে দুইজনে গোপনে পরামর্শ করিত—আমাদের ভাই দুজনের বিয়ে কিন্তু এক বাড়িতে হওয়া চাই। এক বাড়িতে দুই ভায়ের সঙ্গে।

মণি বলিত, না ভাই. এক মায়ের দুই ছেলে হ'লে হবে না। দুই খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই। দেখিস নি—আমার মেজদা—আর মেজখুড়ীর ছেলে সেজদার কেমন ভাব? ওদের বউদের কেমন ভাব দেখেছিস তো! এ ওকে বলে তুই—ও একে বলে তুই।

সনকা পুলকিত হইয়া বলিত, হ্যাঁ ভাই।

কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা তাহাদের পূর্ণ হইল না। ভাগ্যচক্রের চক্রান্তে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ একদিন সনকার বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রটি এই গ্রামেরই ভাগিনেয়। বাল্যকালে এই ছেলেটির নাম করিতেও লোকে শিহরিয়া উঠিত। পনরো ষোল বৎসর বয়সে একদিন সে স্কুলের শিক্ষকদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া একজন শিক্ষককে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তারপর কেমন করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়া হাজির হয়—সে কথা এখানে অবান্তর। সেখানে সে প্রথমে আরম্ভ করে এক বাঙালীবাবুর ঘরে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ, তারপর হয় সে ফেরিওয়ালা, তারপর হয় দোকানদার। ক্রমে কয়লার ডিপো, কাঠের গোলা, পুরাতন লোহালক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হইয়া উঠিল। তারপর দীর্ঘকাল পরে অকস্মাৎ একদিন সে হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট পরিয়া প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের হিসাব লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। সমগ্র দেশটা তাহার প্রশংসায় হইয়া উঠিল পঞ্চমুখ। দূর দূরান্তরের আত্মীয়-স্বজনেরা মিনতি করিয়া পরম আবেগপূর্ণ ভাষায়, ইহাকে দীর্ঘ দিন না দেখার বেদনা জানাইয়া একবার দেখা দিতে পদধূলি দিতে আমন্ত্রণ জানাইল। সেইরূপ একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সে একদিন এই গ্রামটিতে মাতুলালয়ে আপনার নূতন মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু লোকে বলিল তাহাকে টানিয়া আনিল সনকার অতি-প্রসন্ন ভাগ্যদেবতা, ভাগ্যচক্রের খেয়ালী পরিচালক। কারণ সে সনকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং বিনা পণেই নিজে উপযাচক হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—পাত্রটির কি খুড়তুতো কি জাঠতুতো সমবয়সী ভাই না থাকিলেও সনকা বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে আপনার ভাগ্যকে অভিনন্দিত করিয়া সে হরেন্দ্রর হাতে হাত মিলাইয়া আত্মসমর্পণ করিল। মণিমালাও কোন অভিমান করিল

না, সে বরকে নানা কৌতুক রহস্যে বিব্রত করিয়া তুলিল। হরেন্দ্র কয়েকদিন পরই সনকাকে লইয়া চলিয়া গেল রেঙ্গুনে।

মাস আষ্টেক পর মণিমালারও বিবাহ হইয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি, পাত্রটি তখন লাহোর কলেজে সদ্য সদ্য অধ্যাপকের পদ পাইয়াছে। মনীশ নামকরা কৃতি ছাত্র, মণিমালার বাপ অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া মনীশের মত পাত্র সন্ধান করিয়াছিলেন। বিবাহের পরই তিন দিনের দিন মণি মনীশের সহিত চলিয়া গেল লাহোর।

তারপর চার বৎসর পর অকস্মাৎ দুইজনেরই আবার দেখা হইয়া গেল কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে। সেদিন নূতন নাটক 'মণিহারে'র উদ্বোধন রজনী। সনকা আসিয়া মেয়েদের বসিবার যায়গায় প্রথম শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিল। সনকা বেশ একটু মোটা হইয়াছে—পরনে তাহার বেনারসী শাড়ি, হাতে একহাত জড়োয়া চুড়ি, গলায় হীরার কণ্ঠি—উজ্জ্বল আলোকের প্রতিভাতিতে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সঙ্গে পানভরা মস্ত একটা রূপার বাক্স। থিয়েটারের ঝি-টা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাড়াতাড়ি বসিবার আসনখানি ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, আমি আজ ঠিক জানতুম যে, মা আমার আসবেন।

সনকা হাসিয়া বলিল, তুমি একটা কাজ কর দেখি, আমাদের গাড়িটা চেন তো! গিয়ে সায়েবকে ব'লে দাও, থিয়েটার ভাঙবার আগেই যেন আসেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

ঝি তাড়াতাড়ি সনকার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য ছুটিল। নীচে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। যাইবে না কেন, মণিহারের লেখক যে নাম করা লেখক—বিদ্বান ব্যক্তি। মেয়েদের আসনেও যথেষ্ট ভিড়। প্রথম শ্রেণীতে সনকা লক্ষ্য করিল, অনেকগুলি মাত্র মহিলা বসিয়া আছেন। সহসা সে লক্ষ্য করিল, ও পাশ হইতে একটি বেশ ফ্যাসানদুরস্ত মেয়ে ঘন ঘন তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। মেয়েটি দেখিতে বেশ, এবং বেশভূষা প্রসাধনে বেশ একটু আধুনিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সনকা মুখ ফিরাইয়াও হাতের জড়োয়া চুড়িগুলি বেশ করিয়া বাহির করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পর আবার একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেয়েটি তাহাকে দেখিতেছে। এবার সনকার মনে হইল, এ যেন চেনা মুখ। তবুও সনকার তাহাকে ভাল লাগিল না। উহার ঐ আড়ম্বরহীন অথচ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বেশভূষা তাহার এই ঐশ্বর্যময়ী দেহসজ্জাকে

ব্যঙ্গ করিতেছে—মেয়েটির দৃষ্টির মধ্যেও যেন কৌতুক রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

সনকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বলিল, কি দেখছেন এমন ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে?

মেয়েটি এবার উঠিয়া আসিয়া সনকার পাশের আসনটা দখল করিয়া বসিয়া বলিল, আপনাকে। আপনার গয়না নয়।

সনকা মনে মনে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল, কিন্তু এই প্রকাশ্য আসরে সেটুকু বাধ্য হইয়া গোপন করিয়া বলিল, কথামালার একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল আমার। সেই একটা শেয়াল বলেছিল—আঙুর টক।

মেয়েটি সনকার বাক্য-বিষ গায়েই মাখিল না, বেশ হাসিমুখেই বলিল, আপনাকে আমার ভারী ভাল লাগছে। কিছু পাতাতে ইচ্ছে করছে ভাই।

বেশ ত, কি পাতাবেন? চোখের বালি?

না ভাই; বেশ মিষ্টি কিছু, ধরুন—বকুল।

সনকা এবার বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। মেয়েটি আবার বলিল, কিম্বা আজ মণিহার দেখতে এসেছি—মণিমালা পাতাই দুজনে।

সনকা হা হা করিয়া হাসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, মর—মর তুই মর। এত রঙ্গও তুই করতে পারিস!

মণি বলিল, আর তুই মুটকি আরও খানিকটে মোটা হ, তবেই আরও চিনতে পারব।

সনকা মনের পুলকে হা হা করিয়া হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল। মণি বলিল, তবু আমি তোকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম, বকুল এখানে কেমন ক'রে আসবে, তারা থাকে রেঙ্গুনে! তারপর কবে এলি এখানে বল্।

সনকা চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, কবে মানে? আমরা তো এখন কলকাতাতেই; এখানেই বাড়ি করেছি, এখানেই এখন ওঁর আপিস! আট মাস হয়ে গেল এখানে আসা।

আট মাস! মণিমালার বিস্ময়ের যেন অন্ত ছিল না।

সনকা এবার প্রশ্ন করিল, আমারও চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু লাহোরের পণ্ডিত-পণ্ডিতানী এখানে কেমন করে আসবেন ভেবেই পাই না।

মণি বলিল, ওমা, আমরাও যে এক বছরের ওপর এখানে এসেছি। পণ্ডিত মহাশয় না কি বল্লি—তিনি যে এখন এখানে পণ্ডিতি করছেন!

বলিস কি? বাসা কোথায় লো?

বালিগঞ্জে।

বালিগঞ্জে? ওমা, আমি যাব কোথায় গো? ও উনোনমুখী, আমার বাড়িও যে বালিগঞ্জে!

মণি এবার বলিয়া উঠিল, এইবার আমি বলছি—তুই মর—মর—মর। তুই পোড়ারমুখীই তো চিঠি লেখা বন্ধ করেছিস!

সনকা কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, যাক্‌গে মরুকগে—কি বলে যে সেই—গতস্য শোচনা নাস্তি! দেখা তো হ'ল। ভাগ্যে আজ তুই থিয়েটার দেখতে এসেছিলি! আমি তো প্রায় আসি—এক একটা বই আমার দুবার তিনবার দেখা!

মণি বলিল, আমিও তো মাঝে মাঝে আসি। কিন্তু আশ্চয্যি, এতদিন দেখা হয় নি!

সনকা এবার বলিল, তোমার পণ্ডিতজী কই? দেখা না ভাই! কেমন হ'ল পণ্ডিতজী তোর—বল্। আমি তো দেখি নি!

মণি বলিল, নেই এখন নীচে। দাঁড়া, থিয়েটার আরম্ভ হোক, দেখাব।

সনকা প্রশ্ন করিল, কেমন ভালবাসে লো তোকে? প্রতাপের মত, না চন্দ্রশেখরের মত?

ওদের কারও মতই না।

তবে?

বেশ সলজ্জ অথচ গৌরবের সহিত মণি বলিল, সে বলিস নে ভাই। মালা মালা ক'রেই পণ্ডিতজী আমার পাগল। মণিমালা আর ফুলের মালা। ঘরে মণিমালা আর বাইরে ফুলের মালা!

বলিস কি লো? বাইরে ফুলের মালা কি লো? কার কাছ থেকে ফুলের মালা নেয় তুই ছাড়া!

যে দেয়। এখন তোর কথা বল্। তোর তিনি কই?

সনকা বলিল, তাঁর কথা আর বলিস নে। তিনি আবার সায়েব। তবে ধারা ঐ এক। শুধু সোনা—সোনা আর সোনা। আমার নাম দিয়েছে সোনা, আর বাইরে দিন রাত্রি সোনা—টাকা—নোট—এই কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য্য মানুষ ভাই, যদি কোন দিন কিছুতে মন খারাপ হ'ল হয় তো মুখ নামিয়ে আছি—সন্ধ্যার সময় একখানা গয়না এনে হাজির। যদি বলি—ও কেন?

উত্তর হ'ল, মুখ ভার করেছিলে যে! পুলকিত তৃপ্তির হাসিতে সনকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কই ভাই, তোর সায়েব কই?

সনকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, সায়েব লোকে আবার বাংলা থিয়েটার দেখে! বললাম যে, আশ্চর্য্য মানুষ। বলে কি—হ্যাঃ, ও রাবিশ আবার দেখে! কিছুতে আসে না ভাই। আমি থিয়েটার দেখতে আসি—আমায় নামিয়ে দিয়ে সায়েব হয় ইংরেজী বই দেখতে যায়, নয় তো কোন বন্ধু—তাও অধিকাংশ সায়েব—তাদের ওখানে যায়। আবার ঠিক থিয়েটার ভাঙবার আগেই গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়। আজও আমায় নামিয়ে দিয়ে কোন্ সায়েবের ওখানে গেল। সেই শেষ হবার সময় আসবে আবার।

মণি এবার প্রশ্ন করিল, ছেলেপিলে কি তোর?

তোর?

আমার? মণিমালা না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল।

হয় নি এখনও?

না। তোর?

দুটি হয়ে মারা গেছে। সনকা এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ওদিকে ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অপসারিত হইতেছিল—পাদ-প্রদীপগুলি তখন সারি সারি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দর্শকমণ্ডলী আপন আপন স্থানে একে একে আসন গ্রহণ করিতেছিল।

সনকা বলিল, এই ভদ্রলোকের লেখা আমার এত ভাল লাগে ভাই—কি বলব তোকে।

মণি একটু হাসিল।

যবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইতেই রঙ্গমঞ্চের উপর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আমরা আজ পালন করব, তারপর অভিনয় আরম্ভ হবে। সে কর্ত্তব্য মাত্র আমাদের অর্থাৎ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতা-দেরই নয়—সে কর্ত্তব্যে আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আজ আমরা আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয়ে প্রতিভাবান নাট্যকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনীশ মুখোপাধ্যায়

মশায়কে সম্মান প্রদর্শন করব। শ্রীযুক্ত [illegible] প্রতিভার পরিচয় আপনাদের মত নাট্যামোদীদের কাছে দিতে যাওয়া বাহুল্য। তবুও বলব, তাঁহার প্রথম নাটক 'অরুণালোক' আমাদের নাট্যজগতে সত্য সত্যই অরুণালোক। আজ আবার তাঁর নূতন নাটক 'মণিহার' অভিনীত হবে—আশা করি 'মণিহার' —বঙ্গবাণীর কণ্ঠে মণিহার রূপে শোভা পাবে।

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। তারপর নাট্যকার অধ্যাপক মনীশ মুখোপাধ্যায় আসিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন করিতেই পুনরায় করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়জন মাল্যদানে নাট্যকারকে অভিনন্দিত করিল।

সনকা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল। মণি মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখলি?

কি?

ফুলের মালা কুড়োনোর ধুম! বলছিলাম না, মণিমালা আর ফুলের মালা এই হ'ল পণ্ডিতজীর বাতিক!

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সনকা এবার প্রশ্ন করিল, উনিই তোর বর?

গৌরবের হাসি হাসিয়া বলিল, উনিই আমার পণ্ডিতজী!

মণি আবার হাসিয়া বলিল, বাতিকের কথা আর বলিস নে ভাই। কোন দিন সন্ধ্যেতে যদি মানুষ বাড়িতে দুদণ্ড স্থির থাকল। আজ এখানে সভা, কাল ওখানে থিয়েটারে ওঁর বই হচ্ছে, পরশু কোন জায়গায় অভিনন্দন—আর ফিরে এসে ঘুমন্ত আমাকে ঠেলে তুলে ফুলের মালার বোঝা গলায় চাপিয়ে দেবে!

সনকা কোন উত্তর দিল না, সে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়াছিল—আবার ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অপসারিত হইতেছিল! অকস্মাৎ সাদা আলো নিবিয়া প্রগাঢ় নীলবর্ণের আলোকধারায় স্নান করিয়া রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বিচিত্র দৃশ্য আত্মপ্রকাশ করিল। অভিনয় আরম্ভ হইল।

প্রথম অঙ্ক শেষে সনকা হাসিয়া বলিল, পণ্ডিতজীকে আমার প্রণাম জানাস ভাই! উঃ, কত বড় বিদ্বান লোক!

মণি হাসিয়া বলিল, বলিস কি? প্রণাম? সে তুই নিজে জানাস ভাই।

সনকা বলিল, বেশ, কবে আমার ওখানে আসছিস বল্? আমার বিয়ে

আগে হয়েছে—ঘর আমার আগে—সুতরাং আমার বাড়ি নেমন্তন্ন আগে রাখতে হবে।

মণি বলিল, দাঁড়া ভাই, পণ্ডিতজীর আবার অবসর দেখতে হবে। সভা-সমিতি থাকলে তো হবে না।

সনকা অকস্মাৎ হাসিয়া বলিল, এদের দুজনে বেশ মিলবে কিন্তু! একজন বলবেন—কয়লার দর যা চড়েছে আজ বুঝলেন! উনি বলবেন—রবিবাবুর ওই কবিতাটা পড়েছেন আপনি?

ঝিটা আসিয়া বলিল, কই গো বড়মা—আজ যে আপনার কিছু অডার হ'ল নি? কি আনব বলুন?

সনকা বরাত করিল চা ও কিছু খাবারের।

সনকা খাবার তুলিয়া মণির পাতে দিতেছিল—হাত নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলি হইতে আলোক-প্রতিচ্ছটা চারিদিকে জলকণার মত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মণি প্রশ্ন করিল, চুড়িতে তোর কি পাথর ভাই বকুল?

সনকা বলিল, হাঁরে। বলিস কেন—গয়না গয়না একটা বাতিক। কত টাকা যে গয়নাতে বন্ধ হয়ে রয়েছে তার হিসেব নেই। আর একটা চপ নে ভাই।

মণি বলিল, না না ভাই, কিছু ভাল লাগছে না আমার। আর দিস নে।

পঞ্চম অঙ্কের শেষ হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, ঝিটা আসিয়া সনকাকে ডাকিল, মা, বাবু গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে—

সনকা তখন নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির বেদনায় অভিভূত হইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতেছিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, দাঁড়াতে বল গে। এখন খানিকটা দেরি আছে।

ঝি চলিয়া গেল। সনকা আপন মনেই বলিল, এমন কাঠখোট্টা মানুষ তো আমি দেখি নি!

বর্ষার মেঘাবৃত আকাশ অকস্মাৎ একদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া যেমন শরতের প্রসন্ন স্বর্ণালোকে ধরিত্রী হাসিয়া ওঠে, ঠিক তেমনই করিয়া নাটকের সমস্ত বিয়োগসম্ভাবনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া অতি সুষ্ঠু এবং সহজভাবে মিলনান্ত হইয়া নাটক শেষ হইল। রাজকন্যা দরিদ্রের গলায় মণিহার পরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিতে আরম্ভ করিল।

সুনকা উঠিয়া মুগ্ধচিত্তে মণিকে বলিল, সত্যিই, তোর পণ্ডিতজীকে আমার প্রণাম। একদিন আমার বাড়িতে আসতে হবে।

মণি বলিল, বেশ।

কথা বলিতে বলিতেই দুজনে নীচে নামিতেছিল। পথের উপর গাড়ি রাখিয়া অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র সাহেব সিগারেট টানিতেছিল। সনকা হাসিয়া বলিল, ওই যে আমার সায়েব। আয়, আলাপ করিয়ে দি। সুদৃশ্য ঝকঝকে প্রকাণ্ড মোটরখানার কাছে আসিয়া সনকা বলিল, শুনছেন মিস্টার চ্যাটার্জি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হরেন্দ্র বলিল, এস—এস।

শুনুন মশায়! আগে একে নমস্কার করুন। ইনি আমার বকুল, যিনি বাসর ঘরে আপনার—মনে পড়েছে—কর্ণ কি ক'রে দিয়েছিল!

মণিমালা হাসিল। হরেন্দ্র অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিল, নমস্কার। ভাল আছেন আপনি? আপনার সে কাণমলা ভারি মিষ্টি! খুব মনে আছে আমার।

এই যে, তুমি এখানে—

অধ্যাপক মনীশবাবু রাশিকৃত ফুলের মালা হাতে লইয়া মণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সনকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মণি বলিল, ইনি আমার সেই বকুল। আর বকুল, ইনি আমার পণ্ডিতজী! মনীশবাবু সবিনয়ে নমস্কার করিয়া বলিল, বহু ভাগ্য আমার আজ! আপনার দর্শন পেলাম।

মণি আবার বলিল, আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি—আমার বকুলের বর।

মনীশবাবু চ্যাটার্জির মুখের দিকে চাহিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল। চ্যাটার্জি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মনীশের দিকে চাহিয়া ছিল।

সনকা মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিল, আঃ, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আলাপ কর না।

মনীশবাবু তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল, ভারী সুখী হলাম মিস্টার চ্যাটার্জি!

হরেন্দ্র হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি।

সনকা গাড়িতে উঠিয়া বলিল, তা হ'লে আমার বাড়িতে একদিন আসতে হবে ভাই বকুল।

নতুন গাড়িটা জলের উপর নৌকার মত যেন পিছলাইয়া চলিয়া গেল। মনীশবাবু একখানা ট্যাক্সী ডাকিয়া মণিকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া মণি বিরক্তিভরে বলিল, উঃ! ছি, আবার তুমি আজ খেয়েছ? মনীশবাবু তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া বলিল, আমায় মাফ কর মণি। ও জন্যে আমায় আর কিছু তুমি ব'ল না। বলেছি তো মজলিসে—আসরে—থিয়েটারে যাই, বন্ধু বান্ধব—শিল্পী—এমনই বিশিষ্ট লোকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করে। ঠেলতে পারি নে। আর ঠেলাটাও অভদ্রতা হয়। মণি চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল, ভাগ্যবতী আমার বকুল। ধন, ঐশ্বর্য্য, বাড়ি ঘর—গাড়ি গয়না কিছুর অভাব নাই—অনুগত স্বামী।

মনীশ হাসিয়া বলিল, অনুগত স্বামী!

মণি ঈষৎ তপ্তস্বরে বলিল, হাসলে যে! জান, বকুল মুখভার করলে সে পৃথিবী অন্ধকার দেখে! সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন গয়না সে এনে দেয়। ওর হাতের জড়োয়া চুড়িগুলি দেখেছ? আলো যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! সমস্তগুলো হীরে।

মনীশ এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগুলো তোমার বকুলের দুর্ভাগ্য মণি।

মণি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার কথার ঐ এক ধারা! ধন অলঙ্কার কখনও দুর্ভাগ্য হয়?

মনীশ বলিল, ধন অলঙ্কার দুর্ভাগ্য নয়, কিন্তু তোমার বকুলের ভাগ্যে ওগুলো সত্যিই দুর্ভাগ্য! তোমার বকুলের স্বামী ওই মিস্টার চ্যাটার্জিকে আমি ভাল ক'রে জানি। থিয়েটারের অভিনেত্রী মহলে এবং কলকাতার বিশিষ্ট পাড়ায় লোকটি পরম সম্মানিত ব্যক্তি। ওঁর প্রসাদ তারা অনেকেই পেয়েছে। ভদ্রলোক এই সে দিন থিয়েটারেরই সুরমা ব'লে একটি সুন্দরী শক্তিশালিনী অভিনেত্রীকে থিয়েটার ছাড়িয়ে অর্থবলে আয়ত্তাধীনা করেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে খোঁজ করলেই ওঁকে পাওয়া যায়।

মণি স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পর সে বলিল, কিন্তু বকুলকে দেখে তো তা মনে হ'ল না। স্বামীর কথা বলতে সে যে অজ্ঞান!

মনীশ বলিলেন, হাসি দিয়ে দুঃখ ঢাকতে মানুষকে তো শেখাতে হয় না মণি, বিশেষ যেখানে মানুষ সে দুঃখের জন্য পরের কাছে খাটো হয়; কিম্বা হয় তো সত্যি সত্যিই তোমার বকুল এ কথা জানেন না, দুর্ভাগিনী উনি—ধন অলঙ্কারের মোহেই অন্ধ হয়ে আছেন—দেখতে পান না।

মণি স্বামীর কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, উঃ, মা গো! দাঁড়াও আমি বকুলকে বলছি।

শিহরিয়া উঠিয়া মনীশ বলিল, না না না মণি, এমন কাজ তুমি ক'র না। কেন তার সুখের ঘর ভেঙে দেবে! জীবনে অশান্তি এনে দেবে!

মণিও শিহরিয়া উঠিল, বলিল, তা সত্যি!

বাড়ি পৌঁছিয়া সনকা হরেন্দ্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। হরেন্দ্রর মদ্যপানের মাত্রা সেদিন অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছিল। বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, মাথায় ওডিকলনের জল দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সনকা ছল ছল চোখে বলিল, আমি এবার বিষ খেয়ে মরব।

হরেন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, সোনা, সোনামণি আমার, আমি তা হ'লে ম'রে যাব। ম'রে যাব—সত্যি বলছি ম'রে যাব।

সনকা বলিল, কেন তুমি ওগুলো খাও?

হরেন্দ্র শুধু কাঁদিতেই থাকিল—না না সোনা—বিষ খেয়ো না—ম'রে যেয়ো না! সনকা আবার ওডিকলনের জল মাথায় দিয়া ফ্যানটার গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীর সহিত চা খাইতে বসিয়া সনকা বলিল, কাল কি কাণ্ডটা করেছ মনে কর দেখি! কেন তুমি ওগুলো খাও?

হরেন্দ্র চায়ের কাপে চামচা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ও কথা তুমি বাদ দাও সোনা। জেনে শুনে তুমি বারবার এই কথা বল এই আমার দুঃখ। সায়েব-সুবার সঙ্গে আমার কারবার—তাহারই আমার বন্ধু। মদটা হ'ল তাদের চায়ের মত। কাজেই না খেলে চলে না।

সনকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সর্ব্বসুখী দেখলুম আমার বকুলকে। বিদ্বান স্বামী—লোকের মুখে মুখে প্রশংসা—মণি বলতে বেচারা

অজ্ঞান। হা-হা করিয়া অট্টহাস্যে হরেন্দ্র সনকার কথার শেষাংশ ঢাকিয়া দিল। সনকা বিরক্তিভরে বলিল, তুমি হাসছ কেন? পাগল হ'লে না কি?

হরেন্দ্র বলিল, আরে, ওই নাট্যকার নাকি বলে, ওই বেটা? আরে দূর দূর! বেটা পয়লা নম্বরের মাতাল আর চরিত্রহীন। থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস-গুলোর ছি-চরণের ছুঁচো! কিছুদিন আগে থিয়েটারের সুরমা ব'লে অ্যাক্‌ট্রেসকে নিয়ে যা ঢলাঢলি করলে, আরে রাম-রাম!

সনকা অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র আবার বলিল, আমাদেরই এক হার্ডওয়ার মার্চেন্ট—সে লোকটা খুব পয়সাওয়ালা—সে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। নইলে দেখতে ওটা এতদিন সেইখানেই দিনরাত পড়ে থাকত। আমি জানব কি করে! আমাকে বললে পুলিসের এক বড় সাহেব। ব্যাপারটা পুলিশের কানেও উঠেছিল। বললে, চ্যাটার্জি, তোমাদের দেশের কি ব্যাপার? একজন প্রফেসর—নামজাদা লেখক—সে এমনধারা মাতাল আর চরিত্রহীন—ছি-ছি-ছি! আমি তো লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলাম।

সনকা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল, কিন্তু বকুলকে দেখে তেমন তো কিছু বুঝতে পারলাম না!

হরেন্দ্র বলিল, বেশ! সে হয়ত জানেই না। স্বামী বিদ্বান—নামজাদা লেখক—এতেই হয় তো সে ভুলে আছে!

সনকা চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, তা একরকম ভাল। না জেনে শান্তিতে আছে—সেও মন্দের ভাল! তুমি যেন ব'ল ট'ল না!

সনকা বলিল, হ্যাঁ, সেও মন্দের ভাল।

হরেন্দ্র টেলিফোনটা তুলিয়া ডাকিল, কে? ঘোষ কোম্পানি—জুয়েলার্স? দেখুন জড়োয়া ব্রোচ একখানা পাঠিয়ে দিন তো—হ্যাঁ এই দশটার মধ্যে।

অপরাহ্নে অধ্যাপক মনীশবাবু সাজসজ্জা করিতেছিল। কোথায় একটা সভা হইবে সেখানে তাহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইবে। মণিমালা নিজের হাতে কাপড় চাদর কোঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যহই সে রাখে। মনীশ জামা গায়ে দিতেই সে নিজে সযত্নে চাদরখানি তাহার গলায় তুলিয়া দিল। মনীশ তাহাকে সাদরে কাছে টানিয়া চুম্বন করিয়া কহিল, বল কি আনিব বালা?

মণি হাসিয়া উত্তর দিল, রাজকণ্ঠের মালা!

এটুকু তাহাদের নিত্যকার অভিনয়। মনীশ বাহির হইতে গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ ভয়ঙ্কর মেঘ করেছে! ছাতি আর বর্ষাতিটা নিতে হবে দেখছি।

মণি তাড়াতাড়ি ছাতি ও বর্ষাতি আনিয়া দিল। মনীশ বাহির হইয়া গেল। মণি জানালায় বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিগঞ্জের নির্জ্জন পল্লীপথ প্রায় জনহীন। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। মণি দৃষ্টি অবনমিত করিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড নূতন ঝকঝকে মোটর একখানা দ্রুতবেগে চলিয়াছে।

ঠিক সনকাদের মোটরটার মত—তেমনই বড়, হর্নের শব্দও তেমনই—নূতনও বটে! হয়ত চ্যাটার্জ্জি চলিয়াছে অভিসারে! অকস্মাৎ মণির মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। হায় বকুল, দুর্ভাগিনী বকুল, সে হয় তো নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জড়োয়ার চুড়িগুলি দেখিতেছে!

ঠিক সেই সময়েই সনকাও বসিয়া মণির কথা ভাবিতেছিল। চ্যাটার্জ্জি বাড়িতে নাই—খিদিরপুরে কোন্ সাহেবের সঙ্গে একটা বড় ব্যবসায়ের কথা আছে—সেখানে গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি হইবে। একা বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিল, হায় দুর্ভাগিনী বকুল, তুই তো জানিস নে ভাই—কি কালকূটভরা ফুলের মালা মনীশ নিত্য তোর গলায় পরাইয়া দেয়!

তাহার চোখ ভরিয়া জল আসিল। আশ্চর্য্য, হঠাৎ যেন তাহার মন মণির দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া খানিকটা তৃপ্তিতেও ভরিয়া উঠিল! অহেতুকী তৃপ্তি!

আকাশে মেঘ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মণি মুখ বাঁকাইয়া সনকার আভরণ-রাশিকে উপহাস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিছানা পাতিতে হইবে—এই বিছানা পাতা কাজটি সে নিজে হাতে করে—অপরের হাতে পাতা বিছানাতে শয়ন করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না।

অকস্মাৎ তীব্র নীল আলোকে সারা আকাশ চিড় খাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু গর্জ্জনে সমস্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! কোন উন্মাদ যেন নিষ্ঠুর অট্টহাসি হাসিতেছে।

পিঞ্জর

ছোট্ট একটি ভ্রাম্যমান বাজীকরের দল।

কাটোয়া হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত বাদসাহী আমলের যে পাকা রাস্তাটা গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তাটা ধরিয়া যাইতে যাইতে পথে একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম পাইয়া দলটি দাঁড়াইল। গ্রামের প্রান্তে গাছের তলায় আস্তানা ফেলিয়া একজন গ্রামের ভিতর চলিয়া গেল; একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কত বড় গ্রাম, কত ঘন বসতি, বসতির ঘর-দুয়ারগুলির শ্রী ও ছন্দ কেমন—সমস্তই দেখিল। খুশী হইয়াই সে গ্রামের শেষ প্রান্তে উপনীত হইল, এবং খুশীতে ও বিস্ময়ে যাহাকে বলে হতবাক হইয়া যাওয়া—সে তাই হইয়া গেল। প্রকাণ্ড পাকা থিয়েটারের স্টেজ, স্টেজের সম্মুখে চার পাঁচ হাজার দর্শক বসিবার উপযুক্ত টিনে-ছাওয়া, পাকা-মেঝে প্রেক্ষাগৃহ।

লোকটা একবার আকাশের দিকে চাহিল, চৈত্রমাস, রোদ প্রখর হইয়াছে, তাহার উপর ঝড়-বৃষ্টির সময়ও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এই সময় এমন একটি আচ্ছাদনের তলে নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত বাসের সুবিধা-সুযোগের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা-সুযোগের কোন অবস্থা বা ব্যবস্থা ভ্রাম্যমান বাজীকর কল্পনাও করিতে পারিল না। জীর্ণ তাঁবুতে ঝড়-বৃষ্টির দুর্য্যোগে তাহাদের নিজেদের দৈহিক দুর্দ্দশায় তেমন যায়-আসে না, কিন্তু খেলা আরম্ভের সময় বা আরম্ভ হইয়া গেলে দুর্য্যোগ নামিলে যে ক্ষতি হয় সে অপূরণীয় ক্ষতি! এমনই করিয়া তাঁবুটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শত শত তালি সত্ত্বেও সহস্রচক্ষু হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য গোটা বর্ষাটাই খেলা বন্ধ রাখিতে হয়। শহরে-বাজারে এমন আশ্রয় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের খেলার মত খেলা দেখিয়া মোহ জাগিবার অবস্থা সেখানকার মানুষের মন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। বৎসরে দশ পাঁচটা বড় বাজী বা খেলা—দুই একটা সার্কাস সেখানে আসে। কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও আছে, সেখানে এমন আশ্রয়ের সুবিধা পাইলে গোটা বর্ষাটাই খেলা চলিতে পারে। লোকটি গুর্খা-জাতীয়, বন্য-পার্ব্বত্য প্রদেশের মানুষ। জীবনে উল্লাস সাধারণতঃ

নিরুচ্ছ্বাসিত, উল্লাসে ইহারা আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসে, কিন্তু নিঃশব্দে। কেবল ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুত কথা বলে এবং সকল প্রকার গতির মধ্যে শক্তির একটা সবল ক্ষিপ্রতা প্রকটিত হইয়া ওঠে। উৎসাহ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। বেঁটে লোকটি খাটো পায়ে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল বেগে হাঁটিতে আরম্ভ করিল; হাফ-শার্ট আবৃত লোকটির অর্দ্ধ অনাবৃত হাত দুটি সজোরে আন্দোলিত হইতেছিল; উল্লাসের উচ্ছ্বাসে নাচিতেছিল কেবল শ্রম-পরিপুষ্ট হাত ও পায়ের পেশীগুলি। আস্তানায় ফিরিয়া মুখভরা হাসি হাসিয়া সে যখন দাঁড়াইল, তখন ছোট চোখ দুটি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া দর দর ধারে ঘাম ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকটার মাথার চুলগুলি লম্বা, সেগুলি গতিবেগে বিশৃঙ্খল হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বছর পঁচিশেক বয়সের একটি স্বাস্থ্যবতী পাহাড়ী মেয়ে উনান ধরাইয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল; একটি পশ্চিম দেশীয় দীর্ঘকায় প্রৌঢ় গাছের শিকড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল, কি খবর?

পাহাড়ীর চোখ একেবারে ঢাকিয়া গেল—বলিল, বয়ুৎ বালা (বহুৎ ভালা)। গাঁও বয়ুৎ বড়া; বালো বালো কুথী (ভাল ভাল কুঠী); সবসে বালো—তিন, তিন-দাগা-জাগা; এ—ই এ—তো বড়া। তামাসা-থিয়েতার দেখানেকা জাগা আছে (সবসে ভালো—টিন—টিন-ঢাকা জায়গা এ—ই এ—তো বড়া তামাসা—থিয়েটার দেখানেকা জায়গা আছে)!

সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পাহাড়ী মেয়েটারও খুশীর হাসিতে চোখ দুটি বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল, মিলবে? মিলবে?

পাহাড়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ—হাঁ। যানে হোগা কেরায়া দেগা; জরুর মিলেগা! তামাম বর্ষা খেল চলে গা; বয়ুৎ বালা খবর (বহুৎ ভাল খবর)।

প্রৌঢ় বলিল, তবে ভাল ক'রে রান্না-বান্না কর লছিমা! খবর ভাল। সে হাসিতে লাগিল।

লছিমা হাসিভরা মুখেই বলিল, খিতুলি—ধোল। অর্থাৎ খিচুড়ি ঝোল!

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, বেশ! বেশ!

সহসা আশ্রয়স্থল গাছটার কাণ্ডের ও-পাশে কিসের ক্রুদ্ধ ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দে সকলেরই দৃষ্টি ওইদিকে আবদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ক্রুদ্ধ

গোঁ গোঁ গর্জ্জন। প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, দেখ, ঝগড়া লাগিয়েছে দুটোতে।

মেয়েটি অর্থাৎ লছমী ক্রুদ্ধ হইয়া উনানের জন্য সংগৃহীত কাঠকুটা হইতে একগাছা কঞ্চি টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রৌঢ় বলিল, ধনপৎ কোথায় গেল? ধনপৎ অর্থাৎ সেই পাহাড়ী পুরুষটি ইতিমধ্যে গঙ্গাতীরের ঊর্দ্ধ্বের প্রান্তরের ঘাস ও ঘনগুল্মের মধ্য দিয়া কোথায় চলিয়াছিল। মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়া কঞ্চি হাতে গাছের ও-পাশে গিয়া একটা খাঁচার সম্মুখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইল।

খাঁচা একটা নয়—দুইটা। বড় বড় লোহার শিক দেওয়া খাঁচা। একটার মধ্যে একটা বড় চিতাবাঘ; অপরটায় দুইটা বাচ্চা—বড় বিড়ালের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই দুইটাতেই ঝগড়া সুরু করিয়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করিতেছিল। বড় বাঘটা বাচ্চা দুইটার ঝগড়া দেখিয়া গোঁ গোঁ আরম্ভ করিয়াছিল। ওই বাঘটাই ও দুইটার বাপ। মা-বাঘিনীটা মরিয়া গিয়াছে।

পাহাড়িনীকে দেখিয়া বাচ্চা দুইটা খাঁচার দুই প্রান্তে বসিয়া তাহারই দিকে ভীত অথচ হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে লছমী খাঁচার শিকের মধ্যে হাত পুরিয়া একটার ঘাড়ের চামড়া খামচাইয়া ধরিয়া ঝাঁকি দিল, সেটাকে ছাড়িয়া অপরটাকে ঝাঁকি দিয়া শিকের গায়ে মাথা ঠুকিয়া দিয়া নিজের ভাষায় বলিল, ফের করবি ত ভোজালী বসিয়ে দেব।

বড় বাঘটা তখন শিকের গায়ে পিঠ ঘষিতে ঘষিতে ঘড় ঘড় শব্দ আরম্ভ করিয়াছে; লছমী হাসিয়া তাহার পিঠে হাত দিল। বাঘটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দাঁতগুলি বিস্ফারিত করিয়া উঠিল—হাঁ—উ!

ও পাশে প্রৌঢ়টি তখন বলিতেছিল, কোথা থেকে আনলে?

উত্তর দিল ধনপৎ, ক্ষেতমে—ক্ষেতমে—গাস খাতা—গাস! অর্থাৎ—ক্ষেতে—ক্ষেতে—ঘাস খাচ্ছিল—ঘাস।

লছমী এ দিকে আসিয়া দেখিল, ধনপতের পায়ের কাছে একটা মরা ছাগল; ছাগলটার ঘাড় দুমড়াইয়া সেটাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। পাহাড়ীর ক্ষুদ্র চোখে চিলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

দূরে প্রান্তরে কোথায় ছাগল চরিতেছিল, তাহার দৃষ্টি সেখানে নিবন্ধ

হইয়াছিল, নিঃশব্দে আড়ালে আড়ালে গিয়া সেটাকে ধরিয়া সে নীরব রক্তহীন হত্যা করিয়া লইয়া আসিয়াছে। লছমী উল্লসিত হইয়া উঠিল।

ক্ষুদ্র দলটি গ্রাম্য থিয়েটার ক্লাবের টিনের শেডের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও স্টেজের মালিক স্থানীয় ধনী জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। দৈনিক ভাড়া ছয় আনা—মাসের উপর হইলে, মাসিক ভাড়া দশ টাকা। ইহা ছাড়া, দিন পাস দুইখানা—একখানা জমিদারের [illegible] জন্য, অপরখানা পাইবে ড্রামাটিক ক্লাব। জমিদারের বাড়ির জন্য দ্বার অবারিতই রহিল।

বড় হইলেও গ্রাম, শহর নয়; বিলাতী বাঁশী বা জয়ঢাক এখানে পাওয়া যায় না; বিকল্পে একজন গ্রাম্য মুচী সমস্ত গ্রামময় নাগরা বাজাইয়া গুর্খাটির সঙ্গে ফিরিল। গুর্খা এক বাণ্ডিল ঘুড়ির রঙিন কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপন গ্রামময় বিলি করিয়া দিল। মুখে বলিল, বাদী—বাদী; মাদিক—মাদিক—বয়ুৎ বালা। বাগ হ্যায়—বাগ। এ-ই বড়া! সবসে বালা, রাক্সস্—রাক্সস্—নররাক্সস্! হাঁত মুরগী খায় দান্ত-দান্ত। অর্থাৎ সকলের চেয়ে ভাল—রাক্ষস—নররাক্ষস। সে হাঁসমুরগী খায় জীবন্ত! কাগজেও ধ্যাবড়া ছাপা সেই বৃত্তান্ত। অত্যাশ্চর্য্য ম্যাজিক—ভোজবাজী। ভীষণ শার্দ্দুলের সহিত স্ত্রীলোকের খেলা! জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য—নররাক্ষস—নররাক্ষস—নররাক্ষস!

সকলে, বিশেষত ছেলেরা, সভয় বিস্ময়ে প্রশ্ন করিতেছিল, নররাক্ষস?

হাঁ-হাঁ! নর রাক্সস্! হাঁত-মুরগী খায়—দান্ত—দান্ত! বলিতে আকর্ণবিস্তার হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি ঢাকিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল।

টিনের নিরাপদ আচ্ছাদনের নীচে, চারিদিকে তাঁবুর কানাৎ খাটাইয়া তাহারই মধ্যে তাহারা আসর ও আস্তানা পাতিয়া বসিল। কানাতের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এক প্রান্তে ছোট একটি কাপড়ের কুঠরী বানাইয়া তাহার মধ্যে আস্তানা গাড়িল—পশ্চিম দেশীয় প্রৌঢ়। সেই প্রান্তের আর এক পাশে একটি ঘর করিয়া তাহার মধ্যে নীড় বাঁধিল—পাহাড়িনী, তাহার সঙ্গে দুইটা খাঁচায় তিনটা বাঘ। গুর্খাটা থাকে সর্বত্র—যে দিন যেখানে—আচ্ছাদনতলের যে কোন স্থানে ধুলার উপর পড়িয়া থাকে।

ওই লোকটাই নররাক্ষস। একটা কাপড়ের আবরণ সরাইয়া দিলে দেখা যায়—একটি খুঁটির সঙ্গে আবদ্ধ কোমরে বাঁধা পাহাড়ীটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। কোমরে একটি সামান্য কৌপীন ছাড়া আর কিছু নাই, পাথরের মত কঠিন পেশীবহুল উলঙ্গ পীতাভ দেহ, মাথার দীর্ঘ পিঙ্গলাভ চুলের আবরণে আবৃত মুখ—সে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। তাহার উপর সম্মুখে থাকে একটা প্রকাণ্ড ধূপদানি; তাহা হইতে উঠিতে থাকে ধূসর যবনিকার মত ধোঁয়ার পুঞ্জ। লোকটা বিকট চীৎকার করে—হাঁই-হাঁই—হিংস্র ক্ষুধার্ত্তের মত। তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়—পায়ে ও পাখায় বাঁধা হাঁস অথবা মুরগী—লোকটা টপ করিয়া লুফিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই গলায় দাঁত বসাইয়া কণ্ঠনালীটা ছিঁড়িয়া দেয়—ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হয়; সেই রক্তে সে আপনার পীতাভ মুখ ও শরীর রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠে। তারপর সে ভীষণ গ্রাসে আরও দুই চারিটা কামড় দেয়—হাতে টানিয়া টানিয়া পালকগুলি ছড়াইয়া দেয়, শেষে অভিভূত দর্শকের বিহ্বলতার সুযোগ লইয়া দড়িটা ছিঁড়িবার অভিনয় করে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়িনী পর্দ্দাটা টানিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দেয়। ইহার সবটা তাহার অভিনয় নয়; প্রচুর সস্তা মদ খাইয়া সত্যই সে তখন অর্দ্ধ-উন্মত্ত; রাক্ষসের মত বন্য।

পশ্চিমদেশীয় প্রৌঢ় দেখায় ম্যাজিক! তাসের খেলা—সিন্দুকের খেলা—থট-রিডিং এবং আরও অনেক চমকপ্রদ ইন্দ্রজাল, হামামদিস্তায় ঘড়ি চূর্ণ করিয়া সেটাকে আবার নিখুঁত পূর্ব্ব-অবয়বে পরিণত করা, সামান্য এক টুকরা কাগজ চিবাইয়া মুখ হইতে দশ-বিশ হাত রঙিন কাগজের মালা বাহির করা—এমনি অনেক কিছু!

এই লোকটি কেমন করিয়া যে এই বন্য-পাহাড়ী বাজীকর-বাজীকরীর সহিত মিলিয়াছে, সে কথা সাধারণের নিকট বিস্ময়কর হইলেও উহাদের নিকট কিছুই বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নয়। ইহাদের সহিত ভাগে খেলা দেখায় সে। কিছু দিন পূর্ব্বে একটা মেলায় তাহাদের দেখাশোনা—সেইখানেই তাহাদের যৌথ কারবারের প্রস্তাব এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ওই পাহাড়ীটাও পাহাড়িনীর কেহ নয়; পাহাড়িনীর পূর্ব্ব-স্বামীর খেলায় পাহাড়ী ছিল বেতনভোগী খেলোয়াড়, এখন সেও একজন অংশীদার।

বাঘ ও বাঘের বাচ্চা পাহাড়িনীর সম্পত্তি; সে-ই বাঘ লইয়া খেলা দেখায়। পাহাড়িনীর পূর্ব্ব-স্বামীর সম্পত্তি ছিল এগুলি। বাচ্চাগুলি অবশ্য তখন

জন্মায় নাই; তখন ছিল ওই পরিণতবয়স্ক বাঘটা এবং একটা বাঘিনী—এই শাবকগুলির জননী।

বড় বাঘটাকে বাহির করিয়া পাহাড়িনী একটা টুল পাতিয়া দিয়া হুকুম করে, বৈঠ্।

সে টুলের উপর উঠিয়া বসে। বাঘটা দাঁড়ায় পাহাড়িনী তাহার পিঠে সওয়ার হয়। একটা প্লেট সে দাঁতে কামড়াইয়া ধরে—বাঘটা সেই প্লেট হইতে দুধ খায়। পাহাড়িনীর হুকুম মত লাফাইয়া টুল পার হইয়া যায়। বাঘের বাচ্চা দুইটাকে সে সন্তানের মত কোলে করিয়া বসে; তাহার হুকুম মত একটা আর একটাকে লাফ দিয়া টপকাইয়া যায়। সেলাম করিতে বলিলে—একটা পা তুলিয়া দেয়। একটা বালিশ দিয়া শুইতে বলিলে, দিব্য তাহাতে মাথা দিয়া শোয়।

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পাহাড়িনী তাহাদের পরিচর্য্যা করে, শাসন করে, আদর করে—কথা কয়। সকাল বেলায় বাচ্চা দুইটাকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া খাঁচা হইতে বাহির করিয়া আনে। একটা বুরুশ দিয়া তাহাদের গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দেয়। বাচ্চা দুইটা আরামে শির-দাঁড়া বাঁকাইয়া পিঠ উঁচু করিয়া ঘড় ঘড় শব্দ করে, লেজটাও 'ত'-কারের ভঙ্গিতে বাঁকা করে। কখনও কখনও হিংস্র হইয়া উঠে, দু'চারিটা নখও অকস্মাৎ বসাইয়া দেয়; ক্রুদ্ধ হিংস্র ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে; পাহাড়িনী বাঁ হাতে ঘাড়ের চামড়া খামচাইয়া ধরিয়া, ডান হাতে পটাপট চড় কষিয়া দেয়; কখনও বা সরু লিক্-লিকে একগাছা বেত দিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করে; কখনও বা যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সজোরে বুকে এমন কৌশলে ধরে যে বাঘের বাচ্চাও হাঁপাইয়া উঠে। সে তখন ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের উপদেশ দেয়—ওরে শয়তান, দুষ্ট! এমন বদমাইসী কি করিতে আছে?

বড় বাঘটাকে লইয়া এতখানি করা চলে না; কিন্তু যাহা করে সেও নিতান্ত কম নয়। বড় বাঘটাকেও একবার শিকলে বাঁধিয়া বাহির করে, খাঁচাটা পরিষ্কার করিয়া আবার তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া দেয়। তাহার গায়েও বুরুশ দেয়; সে সময় বড় বাঘটাও পিঠ বাঁকাইয়া ঘড় ঘড় শব্দ করে, খাঁচায় পুরিয়া দিলে সে শিকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মুখের দিকে চাহিয়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, পাহাড়িনী তাহার ভাষা বোঝে, সে হাসিতে হাসিতে আঙুল দিয়া গা চুলকাইয়া দেয়। তাহার সঙ্গেও সে কথা বলে। হুকুমে কথা নয়—জীবনের কথা—মনের কথা।

সে তাহাদের প্রায়ই প্রশ্ন করে—জঙ্গলমে যায়েগা? জঙ্গলমে? কান খাড়া করিয়া তাহারা পাহাড়িনীর কথা শোনে। দূর হইতে তাহার কথার সাড়া পাইলে, অলস বিশ্রামের মধ্যেও তাহাদের কান অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু-শিরার স্পন্দনে লক্ষ্যের অগোচর কম্পনে কাঁপিতে কাঁপিতে স্ফীত নাসারন্ধ্রের মত বিস্ফারিত হইয়া খাড়া হইয়া উঠে। সাড়া আগাইয়া আসিলে সজাগ হইয়া উঠিয়া বসে। পাহাড়িনীর চোখ মুখ চুল হাসি রাগ সব তাহারা চেনে—অন্ধকারের মধ্যে গায়ের গন্ধে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাকে অনুভব করে। সে চলিয়া গেলে তাহাদের জিহ্বা লালাক্ষরণে সরস হইয়া উঠে—বিলীয়মান গাত্রগন্ধের মধ্যে একটা আস্বাদের অনুভূতিতে জিভ দিয়া ঠোঁট চাটে। তাহার পরিপুষ্ট-পেশী নধরকান্তির আকর্ষণে চোখের দৃষ্টি লোলুপতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কখনও কখনও খাঁচার গায়ে সম্মুখের থাবা দুইটা দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘ লেজটি খাঁচার কাঠের মেঝের ঈষৎ উর্দ্ধে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতে থাকে।

ম্যাজিকওয়ালা বা পাহাড়ী নররাক্ষস বড় একটা বাঘের ধার দিয়া যায় না: পাহাড়িনীও যাইতে দেয় না। এক একদিন নররাক্ষসকে লইয়া বরং বিপদই বাধিয়া উঠে; যেদিন দেহে মুখে রক্ত মাখিয়া মদে উন্মত্ত পাহাড়ী বাঘের খাঁচার সম্মুখে পড়িয়া থাকে সেদিন বড় বাঘটা অস্থির হইয়া উঠে; ছোট দুইটা পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে আর লেজ আছড়ায়। স্বাভাবিক অবস্থায় পাহাড়ীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহারা চঞ্চল হয়; পাহাড়ী হাসে—তাহার কুক্‌রীটা বাহির করিয়া দেখায়!

ম্যাজিকওয়ালা নির্লিপ্ত, সে দূরে দূরেই থাকে; খাঁচার সম্মুখ দিয়া যায় আসে, কখনও কখনও দাঁড়ায়; বিশেষ করিয়া খাওয়ার সময় খাবার দিয়া যখন পাহাড়িনী প্রহরা দেয়, তখন সেও আসিয়া দাঁড়ায়, নীরবে দাঁড়াইয়া সে মৃদু মৃদু হাসে। পাহাড়িনী প্রহরা দেয় নররাক্ষস পাহাড়ীর ভয়ে। লোকটা ভয়ঙ্কর মাংসাশী এবং তেমনি চতুর; সুযোগ পাইলেই লোহার শিক দিয়া বাঘের খাদ্য হইতে কাঁচা মাংস টানিয়া বাহির করিয়া লয়। তাহার সে টানিয়া লইবার কৌশল এত ক্ষিপ্র যে বাঘটা থাবা মারিয়াও মাংসের টুক্‌রা কাড়িয়া লইতে পারে না। কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসাইয়া সামান্য নুন দিয়া খাইয়া ফেলে। মদ হইলে কাঁচা-মাংস পোড়াইবারও প্রয়োজন হয় না।

[illegible] দলটি যেমন একটি দৃঢ় নিরাপদ আশ্রয় এবং স্বচ্ছল উপার্জ্জন পাইয়া বাঁচিল, গ্রামখানি এবং আশপাশের পল্লীবাসীর নিরুৎসব সন্ধ্যাগুলিও তেমনি চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। টিকিটের দাম সামান্যই—ফুল-টিকিট চার পয়সা এবং হাফ-টিকিট দু'পয়সা। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়া আসে—যাহারা দেখিয়াছে, আর দেখিবে না, তাহারাও আসে এবং মধ্যে মধ্যে পকেট নাড়িয়া চাড়িয়া ঢুকিয়াও পড়ে। সপ্তাহে প্রতি সন্ধ্যায় খেলা তো হয়-ই উপরন্তু সোম এবং শুক্রবার হাটের দিনে সকালেও খেলা হয়। এখানকার হাট বেশ বড়, চার পাঁচ ক্রোশের লোক আসিয়া জমে। মাসখানেকের মধ্যেই বাজীর তাঁবুর ভিতর কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ভালকুটী গ্রামের মুচিদের একটা ব্যান্ডপার্টি আছে—সেখান হইতে একটা জয়ঢাক ও একটা কর্ণেট বাঁশীর আমদানী হইল। এখানকারই একটি ডোমের ছেলে নিযুক্ত হইল ঝাড়ু দিবার জন্য। পাহাড়িনী একটু শ্রীমতী হইয়া উঠিল, ম্যাজিকওয়ালা একটা নতুন টুপি ও কোট আনাইয়াছে শহর হইতে; নররাক্ষসের চোখ দুইটা আরও ক্ষুদ্র হইয়া উঠিয়াছে মুখের মাংসের আধিক্যে, মদের দোকানে তাহার খাতিরও বাড়িয়াছে; অসময়েও ভেন্ডার তাহাকে ফিরাইয়া দেয় না, দোকানে গেলে তাহাকে বসিতে চেয়ার দেয়। পাহাড়িনী বাঘগুলির জন্য মাংসের বরাদ্দও কিছু বাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁবুর ভিতরে আসবাবের প্রাচুর্য্য বাড়িয়াছে; একটি স্বতন্ত্র স্থানে এখন হাঁড়িকুঁড়িতে রীতিমত একটি ভাঁড়ার ও রান্নাশালা গড়িয়া উঠিয়াছে, গাছের ডালে দড়ির শিকায় এখন আর রান্নার সরঞ্জাম টানানো থাকে না। রীতিমত একটা সংসার; বাজীকরদের যাযাবরত্বের গতি যেন থামিয়া গিয়াছে, পূর্ণচ্ছেদ না হইলেও একটা ছেদ পড়িয়াছে।

পুষ্টি বাড়িল কিন্তু অভাব হইল তুষ্টির।

নররাক্ষসটা উত্তরোত্তর অশান্ত এবং অধীর হইয়া উঠিতেছিল। চোখ-ঢাকিয়া দেওয়া সেই আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন সে কথায় কথায় আকর্ণ-বিস্তার মুখবিকৃতি করে, ঠোঁটের একদিকের কোণ থর থর করিয়া কাঁপে· মধ্যে মধ্যে দ[illegible] চীৎকার করিয়া উঠে।

তাহার অসন্তোষ খাদ্য লইয়া। পাহাড়িনী খাদ্য তাহাকে প্রচুর পরিমাণে দেয়, প্রশ্ন করে—আউর? লেগা?

গোগ্রাসে গিলিতে গিলিতে নররাক্ষস ঘাড় নাড়ে—না, আউর না!

কিন্তু তবু তাহার সন্তোষ নাই, তবু সে চীৎকার করে, কলহ করে, ম্যাজিকওয়ালাকে মারিতে যায়, শিকের ফাঁক দিয়া বাঘগুলাকে খোঁচা মারে। মনের ধারণা সে প্রকাশ করিয়া বলে না—প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু নাই, কিন্তু তাহার ধারণা ওই ম্যাজিকওয়ালাকে পাহাড়িনী অধিক না হইলেও উৎকৃষ্ট খাদ্য দেয়। শুধু ম্যাজিকওয়ালা নয়, ওই বাঘগুলোকে পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মাংস দেয় পাহাড়িনী।

পাহাড়িনী কিন্তু গ্রাহ্য করে না, সে সম্রাজ্ঞীর মতই কার্য্য পরিচালনা করিয়া যায়। ম্যাজিকওয়ালার সঙ্গে গল্প করে, হাস্য পরিহাস করে—

সাদী করেগা? সাদী?

ম্যাজিকওয়ালা হাসে।

বাঘগুলার পরিচর্য্যা করে, শাসন করে, আদর করে—জঙ্গলমে যায়েগা? পিঁজরা—পিঁজরামে দুখ লাগতা?

বাঘগুলা মুখের দিকে চাহিয়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিয়া কিছু বলে। পাহাড়িনী হাসে। বলে, ব'সে ব'সে খেতে মিলবে তোর সেখানে বেইমান? হরিণ তোর কাছে নিজে থেকে এসে ধরা দেবে, নয়? এক এক দিন খানাই তোর মিলবে না। দেখবি! পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে কে? গাছে ঘষবি? কাঁটা থাকলে মরবি? কেটে যাবে, খুন গিরবে, ঘা হবে! মরবি!

সে চলিয়া যায়; বাঘগুলা ঠোঁট দিয়া জিভ চাটে, খাঁচার শিকের উপর থাবার ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে থাবা দিয়া তালার সঙ্গে লাগানো শিকলটাকে টানিয়া ছিঁড়িতে চেষ্টা করে। আজকাল পরিমাণে অধিক আহার পাইয়া বাঘগুলা পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়া উঠিয়াছে, খেলা-দেখানোর সময় তাহারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী। আদেশ-পালন যা করে তাও ধীরে ধীরে হিংস্র ভঙ্গিতে, অনিচ্ছা এবং অপমানবোধ তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট!

ম্যাজিকওয়ালা একদিন বলিল, খাবার কমিয়ে দে লছিমা। নইলে কোনদিন বিপদ বাধাবে!

লছিমা বলিল, খুন করেগা—খুন। সে আপনার কুক্‌রীটা লইয়া বাঘের খাঁচার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দেখতা হ্যায়—কুক্‌রী? বাচ্চা দুইটার খাঁচার সম্মুখে গিয়া কুক্‌রী ফেলিয়া দিয়া শিকের ভিতর হাত পুরিয়া

দিয়া ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া আনিল। বাচ্চাটা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল। পাহাড়িনী হাসিতেছিল।

ম্যাজিকওয়ালা বলিল, ছেড়ে দে লছিমা। ওগুলোকে নিয়ে আর এমন ক'রে খেলা করিস না। বড়ও হয়েছে আর কে'দোও হয়ে উঠেছে খেয়ে খেয়ে।

সত্য; বাচ্চা দুইটা স্বচ্ছল খাদ্য পাইয়া বেশ সবল এবং বড় হইয়া উঠিয়াছে, দুর্দ্দান্তপনা বাড়িয়াছে; পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও তুষ্টি কমিয়া গিয়াছে। মুক্ত জীবন কি তাহারা তাহা জানে না, কিন্তু সবল দেহে সঞ্চিত শক্তি মুক্তির কামনা জাগাইয়া তোলে। অবাধ গতিতে ছুটিবার কল্পনাটাই তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ।

বড় বাঘটা রাত্রির অন্ধকারে আর ঝিমায় না। শিকল ও শিকের উপর শক্তির পরীক্ষা করে।

আফিংয়ের বিষের মত ঈর্ষার বিষ জীবনের স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল বিশ্রামের মধ্যে পরিপূর্ণ সুযোগে আত্ম-বিস্তার করিতেছিল। গতিশীল যাযাবর জীবনে এমন হইত না। একদা বিষ আপনার মারাত্মক স্বরূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

খেলার শেষে মদের নেশা, ধূপের ধোঁয়া ও কাঁচা রক্তের উষ্ণতার প্রভাবে নিত্যকার মত নররাক্ষসটা চেতনাহীন ঘুমে ধূলার উপর পড়িয়াছিল। দুই-পাশে দুইটা বাঘের খাঁচার মধ্যবর্ত্তী স্থানটার উপর। খেলা-দেখাইবার উজ্জ্বল আলোটা নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টিনের চালের লোহার বর্গায় বাঁধা দড়িতে কেবল একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আলোটা অপর্য্যাপ্ত, তাহার উপর লণ্ঠনের তলাকার তেলের আধারটার বাধা নীচের দিকে প্রকাণ্ড একটি ছায়ামণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে—লণ্ঠনের পরিপূর্ণ আলো ভাসিতেছে শূন্যমণ্ডলে।

গভীর রাত্রে নররাক্ষসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দুই পাশে খাঁচার বদ্ধ দুয়ারের শিকলের ঝন ঝন শব্দ, বাঘগুলোর অস্থির ফ্যাঁস ফ্যাঁস, গোঁ গোঁ শব্দ নিত্যই ধ্বনিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাহার অঘোর ঘুম ভাঙিবার কথা নয়! আজ বাচ্চা দুইটার খাঁচায় তরুণ শ্বাপদ দুইটা দুর্দ্দান্ত ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছে। ওই শিকল লইয়া ঝগড়া। অবোধ হিংস্র শ্বাপদ শিশুদের

প্রত্যেকেই চায় ওই বন্ধনের উপর আঘাত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে। আঘাত করার অধিকারের উপরেই মুক্তির দাবী নির্ভর করিতেছে বলিয়াই তাহাদের ধারণা। আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে আঘাত করিয়া হিংস্র আক্রমণে এ উহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এ দিকের খাঁচায় বড় বাঘটাও শক্তি পরীক্ষার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সেও উহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। গোঁ গোঁ করিয়া সেও শিকের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নররাক্ষস বিকৃত মুখে উঠিয়া বসিল। আপন ভাষায় পশুগুলাকে গাল দিয়া সে ডাকিল—লছিমা!

লছিমা অঘোর ঘুমে ঘুমাইতেছে—নহিলে সে উঠিয়া আসিত। কিন্তু পশু-দুইটার কলহ মারাত্মক রূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়া বন্যপাহাড়ী কুক্‌রী টানিয়া লইয়া উঠিল। খাঁচার কাছে আসিয়া সে কুক্‌রী দেখাইয়া জঘন্য ভাষায় গাল দিয়া শাসন করিল।

সম্মুখেই, পর্দ্দার ওপাশে লছিমার ডেরা; ঘুমন্ত লছিমা বোধ হয় কৌতুক-স্বপ্ন দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। কৌতুক হাসিতে নররাক্ষসেরও মুখ ভরিয়া উঠিল—চোখ দুইটা ঢাকিয়া গেল। সে টানিয়া পর্দ্দাটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ পশুগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ম্যাজিকওয়ালা ও লছমী।

বিষ মাথায় উঠিয়াছে—পাহাড়ী কুক্‌রী উদ্যত করিয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল। বন্য-পাহাড়িনীও মুহূর্ত্তে ম্যাজিকওয়ালাকে আড়াল করিয়া আপনার অস্ত্রখানা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, অসম্বৃত বস্ত্র, ঊর্দ্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। শীতল কঠিন তাহার দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া পাহাড়ী থমকিয়া দাঁড়াইল। বাঘের খাঁচা হইতে মাংস চুরি করিতে গিয়া পাহাড়িনীকে দেখিয়া সে যেমন সঙ্কুচিত হইত, তেমনি সঙ্কোচ তাহার জাগিয়া উঠিল। কতবার পাহাড়িনী তাহাকে চাবুক মারিয়াছে সে কথা মনে পড়িল। এ তাঁবু পাহাড়িনীর সে কথাও মনে পড়িল। পাহাড়িনী অগ্রসর হইল—পাহাড়ী পিছু হটিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল ম্যাজিকওয়ালা দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সে আবার চীৎকার করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু পাহাড়িনীকে অতিক্রম না করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। পাহাড়িনী আগাইয়া আসিতেছে। সেও তাহার এক আতঙ্ক। অধীর হইয়া সে আপনার কুক্‌রীখানা ছুঁড়িল পাহাড়িনীকে লক্ষ্য করিয়া। কুক্‌রীখানার বঙ্কিম

অগ্রভাগ তাহার পাঁজরার নীচে পেটের উপর বসিয়া গেল। পরমুহূর্তেই পাহাড়িনী পড়িল তাহার উপর, তাহার কুক্‌রীখানা একেবারে কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া নিম্নমুখে হৃদ্‌পিণ্ডে আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল।

রক্তে একেবারে ঢেউ খেলিয়া গেল; পিছনে খাঁচার ভিতর বাঘগুলা অধীর তৃষ্ণায় যেন হা হা করিয়া শিক শিকল টুকরা টুকরা করিয়া দিতে চাহিতেছে।

ম্যাজিকওয়ালা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে লোক আসিয়া জমিয়া গেল।

নররাক্ষস মরিয়া গিয়াছে; পাহাড়িনীর তখনও চেতনা ছিল। তাহার রক্তাক্ত হাতখানা সে তখন খাঁচার গায়ে বাড়াইয়া দিয়া হাঁপাইতেছিল; বাঘটা কর্‌করে জিভ দিয়া সেই রক্ত চাটিতেছিল।

ম্যাজিকওয়ালার সঙ্গে চোখে চোখ মিলিতেই ইসারা করিয়া সে ডাকিল।

হামারা শের—বাঘ—

জনতার গুঞ্জনে বাকী কথা ঢাকা পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

দিন কয়েক পরে তদন্তশেষে ম্যাজিকওয়ালা খালাস পাইল। পাহাড়িনী মৃত্যুকালে জবানবন্দী দিয়া গিয়াছে।

আপনাদের গাড়ির উপর খাঁচা ও জিনিসপত্র চাপাইয়া সে রওনা হইল। গঙ্গার তীরভূমি দিয়া পাকা সড়ক। দুই পাশে ঝাউ ও ঘাসের জঙ্গল। ক্রমশঃ গ্রাম বিরল ও জঙ্গল ঘন হইয়া উঠিল। এ জঙ্গলেও বাঘ থাকে। অপরাহ্ণ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া গঙ্গার বুক ও আকাশ ধূসর হইয়া আসিতেছে। দূরে একখানা গ্রাম দেখা যাইতেছে।

রাস্তার একপাশে ম্যাজিকওয়ালা গাড়ি থামাইল। গরু দুইটা গাড়ি হইতে খুলিয়া লইয়া একে একে জিনিসপত্র গরু দুইটার পিঠে চাপাইল। তারপর চাবী দিয়া বাঘের খাঁচা দুইটার তালা খুলিয়া লইল। বাঘগুলা শিকের ফাঁক দিয়া ঘন বনশোভার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছে। শব্দে দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার ফ্যাঁস করিয়া উঠিল। শিকের সম্মুখের কাঠের আবরণ ম্যাজিকওয়ালা ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করে নাই।

তালা খুলিয়া লইয়া সে দ্রুত গরু দুইটাকে তাড়াইয়া গ্রাম-চিহ্নের অভিমুখে

রওনা হইল। পাহাড়িনী তাহার [illegible] জঙ্গলে মুক্তি দিতে বলিয়া গিয়াছে। আর সেদিন পাহাড়িনীর হাতে মানুষের রক্ত চাটিয়া যা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে! সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এমনই ভাবে শ্বাপদগুলোকে মুক্তি দিয়া চলিয়া গেল।

ঘন অন্ধকার। সম্মুখে বনভূমি। পাশে বেত-হাতে পাহাড়িনী দাঁড়াইয়া নাই। শ্বাপদগুলো অস্থির হইয়া উঠিল।

থাবার আঘাতে আঘাতে গ্রন্থিহীন শিথিল শৃঙ্খল ক্রমে ক্রমে এলাইয়া শেষে খসিয়া পড়িল। বড় বাঘটার শিকল খুলিল প্রথম—সে আবার আঘাত করিল—এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। সে প্রথমে ধীরে ধীরে দেহের সম্মুখ-ভাগটা বাহির করিয়া চারিদিক খানিকটা দেখিয়া লইল—তারপর অধীর উল্লাসে লঘু একটা লাফ দিয়া মাটির উপর পড়িয়া বনের মধ্যে যেন নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল।

চারিদিকে কিন্তু ঘন গাছে বাধা দেয়। পথ কোন দিকে? কেমন করিয়া সে-পথে চলিতে হয়? ধীরে ধীরে সে চলিতে আরম্ভ করিল। আঃ! পায়ে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করিল; একটা কাঁটার উপর পা দিয়াছে। যন্ত্রণায় বিরক্তিতে সে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিয়া উঠিল। আবার চলিতে আরম্ভ করিল—অন্ধকার বনের মধ্যে রহস্যময় আনন্দের আহ্বান—তাহার জ্বলন্ত চোখের সম্মুখে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। আবার তাহার গতি উল্লাসে দ্রুত হইয়া উঠিল।

জল চাই, জল! তৃষ্ণা জাগিয়াছে, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া আশেপাশে জলের পাত্রটার অনুসন্ধান করিল। কি বিরক্তিকর! পাত্রটা নাই।

সহসা সর-সর খস-খস শব্দ উঠিতেই সে চমকিয়া উঠিল; খাঁচার অভ্যাস মত ভয় ও বিরক্তিবশতঃ সে ফ্যাঁস শব্দ করিল; পরমুহূর্তেই একটা জানোয়ার ছুটিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সে লাফ দিয়া পড়িল—পড়িল কিন্তু একটা গুল্মের উপর। আঘাত পাইল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিরক্তিতে তৃষ্ণায় উপরের দিকে মুখ তুলিয়া সে শব্দ করিল—আঁ-উ! এমন করিয়াই অভাব অভিযোগে সে পাহাড়িনীকে সংবাদ জানাইত!

কোথায় গেল সে? আবার চলিল।

বাধা বিঘ্ন—গাছের ডালের খোঁচা—কাঁটার আঘাত সহ্য করিয়া সে চলিল।

তৃষ্ণা বাড়িতেছে। আজ সন্ধ্যায় আহারও পায় নাই—ক্ষুধার জ্বালায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে সে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে মুখ তুলিয়া সেই বার্ত্তা জানাইতেছিল—আঁ-উ—আঁউ!

মধ্যে মধ্যে আশে পাশে কত রকম ডাক শোনা যাইতেছে! এক শেয়াল ও পেঁচার ডাক ছাড়া কোনটা সে বুঝিতে পারে না।

সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইল; ও দুইটা কি জ্বলিতেছে? বাচ্চা দুইটার চোখ তাহার মনে পড়িয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার মত অপর একজন গর্জ্জন করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সে লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িল। সে প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল; আক্রমণের কল্পনা—তাহার মনের মধ্যে আভাষেও নাই। সে কোন রূপে এ কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া—ছুটিয়া পলাইতে চায়! উঃ কি ক্ষিপ্রতা—কি কৌশল শত্রুর আক্রমণের!

জড়াজড়ি করিতে করিতে একটা গাছের গুঁড়িতে আঘাত লাগিয়া দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। মুক্তি পাইয়াই মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া ছুটিল। প্রাণভয়ে উন্মত্তের মত ছুটিল। গাছের আঘাত খাইল—কাঁটা ফুটিল—কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ সে করিল না।

বহুদূর আসিয়া সে থামিল; নাঃ—আর সে আসিতেছে না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার দেহও আর বহিতেছে না। সে মুখ তুলিয়া ডাকিল—আঁ-উ—আঁ-উ!

আবার খানিকটা চলিয়া একটা পুকুর ধারে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আঃ, জল!

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে চক্ চক্ করিয়া জল খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পুকুরের জলে হড়াম শব্দ উঠিতেই সভয়ে পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইল! কিছুক্ষণ পর আবার আসিয়া জল খাইয়া সুস্থ হইয়া ডাকিল—আঁ-উ!

এইবার চাই বিশ্রাম! চারিদিকে চাহিয়া পুকুরের পাশেই একটা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল; আঃ, তাহার পুরাতন বাসস্থান সে ফিরিয়া পাইয়াছে। শিকেঘেরা সেই নিরাপদ স্থানটি।

জিনিসটা, এই গ্রামবাসীদের পাতা একটা বাঘ-ধরা খাঁচা! বহুদিন পূর্ব্বে এই জঙ্গলে পাতা হইয়াছিল, বাঘ ধরা পড়ে নাই, খাঁচাটাও আর ফিরাইয়া

লইয়া যাওয়া হয় নাই। কেবল ছাগলটা লইয়া গিয়া কাটিয়া খাওয়া হইয়াছিল। খোলা দরজারটা জাম ধরিয়া উপরে সেই তেমনি উঠিয়াই আছে!

আঃ, এই আশ্রয়টিকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঘটা পাহাড়িনীকে ডাকিল—আঁ-উ!

মালাকার

শারদীয়া পঞ্চমীর সন্ধ্যা।

রায় বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ ধোয়া-মোছার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর ঘড়া কয়েক জল ঢালিয়া একবার ঝাঁটা বুলাইলেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হইয়া যাইবে। ভোলাই কৈবর্ত্ত হাতের নারিকেলের ছোবড়াটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নাঃ. একবার তামুক না খেয়ে আর নয় বাবা।

রমণ গোপও ছোবড়া দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বাঁধানো মেঝে মাজিতেছিল, সে একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, তাই বটে মাইরি। উঃ, কণ্ঠায় কণ্ঠায় অম্বল হয়ে গেল। তামুক না খেলে হেঁটাবে না।

আলোর সম্মুখে হাত দুইখানি ধরিয়া দেখিতে দেখিতে ভোলাই বলিল, এঃ, একেবারে সাদা ফেণ্ডা—শ হয়ে গিয়েছে! একদিনেই যেন হাজা ধ'রে গেল। চুণের দাগ বটে বাবা, উঠতেই চায় না।

রমণ তামাক সাজিতে বসিয়াছিল, সে বলিল, বিঘে খানেক ধানের জমি ভেসে যেত, যে জল ঢালা হয়েছে।

কথাটা সত্য, এবং এই সত্যটা প্রমাণিত করিবার জন্যই যেন ঠাকুরবাড়ির প্রবেশদ্বারে ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই কে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাঃ, গেল! এযে একবারে জাওনগাড়া ক'রে তুলেছে রে বাবা! কাদায় কাদায় নন্দোচ্ছব।

ভোলাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল—এই ঠিক হয়েছে। আসুন মালাকার মশায়, আসুন তো দাদা। জলে জলে জ'মে গেলাম ভাই, লাগান তো একবার জুত ক'রে।

জলসিক্ত উঠানে সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল রজনী মালাকার। তাহার পিছনে দুইটা প্রকাণ্ড চাঙারি মাথায় করিয়া দুইজন মজুর—চাঙারি দুইটা সযত্নে কাপড় দিয়া ঢাকা। রজনী চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে তাকাইয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ব্বা-বা-বা, চণ্ডীমণ্ডপ যে এবার ঝলমল করছে রে! চুণকাম হ'ল বুঝি?

ভোলাই বলিল. হ্যাঁ। চুণকাম তো নয়, আমাদের মরণ,—চুণের দাগ

মাজতে মাজতে হাতে পায়ে হাজা ধ'রে গেল। জলে ব'সে ব'সে হাল্‌নি ধ'রেছে। তাই তো বলছি, একবার লাগান ত ভাই।

রজনী ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, দাদা আমার রসিক সুজন। নাও, পাত হত। বলি, আছ কজন? সবাই খন্দের নাকি? এক—দু—তিন—চার—পাঁচ—ছয়ে ঋতু—আমাকে নিয়ে সাতে সমুদ্দু। লে বাবা—সমুন্দেরে পাদ্য-অর্ঘ্য—লে পাদ্য-অর্ঘ্য ক'রেই সেরে লে।

সে কোঁচড় হইতে একটি পুরিয়া বাহির করিয়া খানিকটা গাঁজা ভোলাইয়ের হাতে দিল। পরিমাণ দেখিয়া ভোলাই সানন্দে বলিল, মেলাই মেলাই, এতেই মেলেই হবে মালাকারমশায়। নেন, বসুন জুত ক'রে। বার করুন আপনার সরঞ্জাম।

রজনী সন্তর্পণে চাঙারি দুইটি মজুরদের মাথা হইতে নামাইয়া লইয়া পূজা-বেদীর প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, ওরে, একজন যা, বাবুদের বাড়িতে গিয়ে ময়দা, মালসা, কাঠ নিয়ে আয়। এনে আঠা চড়িয়ে দে। আর একজন যা তো আমার সেঙাতের কাছে—কালী সিং—কালী সিং মশায়ের কাছে। বলবি, মালাকার আসছে, সেঙাতের কাছেই খাব। খানকতক পরটা করতে বলবি। এ রাতে আর বাবুদের বাড়ির ভাত চলবে না বাবা।

ভোলাই হাসিয়া বলিল, মালাকারদাদা আমার আছেন বেশ। বলি, সেঙাতিনী আছে কেমন আপনার? সে খবরটা নেন, নইলে রাগ করবে যে সেঙাতিনী।

ইঙ্গিতটা কদর্য্য। সেঙাতিনী অর্থে সেঙাত কালী সিংয়ের গৃহকর্ত্রী—একটি নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোক। পশ্চিমদেশীয় ছত্রীর সন্তান কালী সিং বাংলা দেশে আসিয়া ওই মেয়েটিকে লইয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। লোকে বলে, রজনীর এই মিত্রতার সূত্রপাত ওই মিত্রাণীর মোহে, মিত্রটি নিতান্তই গৌণ। লতা হইতে ফুল সংগ্রহ করিতে গেলে, লতার অবলম্বন বৃক্ষে যেমন আরোহণ না করিলে চলে না, তেমনই আর কি।

রজনী কিন্তু রাগিল না, সে হাসিমুখেই বলিল, চাষা বলতে কত বড় দুটো হাঁ করতে হয় জানিস? ঐ হাঁ দিয়েই সব বুদ্ধি তোদের বেরিয়ে যায়, বুঝলি! রোকার প্রণাম কি সবাইকে চলে রে বাবা, তা চলে না। নে, কই কি করলি দেখি? দে, আমাকে দে।

ভোলাই বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, জাতি তুলিয়া রহস্য করায়

রাগও তাহার একটু হইয়াছিল; কিন্তু হাতের ঐ সামান্য খানিকটা বস্তুর খাতিরে তাহার আর কিছু বলিবার উপায় ছিল না। সে নীরবেই হাতের গাঁজাটুকু রজনীর হাতে ঢালিয়া দিল। সরঞ্জামাদি বাহির করিয়া রজনী গাঁজা তৈয়ারি করিয়া বলিল, নে, টিকেতে আগুন দে।

অতঃপর গঞ্জিকাপর্ব্ব। ছোট কল্কেটি হাতের পর হাত ফিরিয়া ঘুরিয়া চলিল। আসরটা নীরব নিস্তব্ধ, প্রত্যেকেই প্রাণপণে টান মারিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ধোঁয়া বুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কথা বলিবার অবসর নাই। কল্কেটা নিঃশেষ হইয়া গেলেও কিছুক্ষণ সকলে বুঁদ হইয়া বসিয়া রহিল, বাহ্যলোকের সহিত সম্বন্ধ যেন ধীরে ধীরে ঢুকিয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ঐ মজুরটা। সে বলিল, আঠা হয়ে গিয়েছে গো। লেগে পড়েন এইবার, শেষ হ'তে রাত কত হবে ভাবেন একবার।

রজনীর চমক ভাঙ্গিল, সে সজাগ হইয়া বলিল, তুমি বেটা আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া, চোখ বুজতে বুজতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে গিয়েছে আঠা এর মধ্যে!

ভোলাই অকস্মাৎ রজনীর হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, মাজ্জনা—মাজ্জনা করতে হবে দাদা।

মার্জ্জনা? কিসের মার্জ্জনা? রজনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছে দাদা।

কি?

ওই ঠাট্টা—সেঙাতিনী নিয়ে।

রজনী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, তার চেয়ে বরং নাটমন্দিরটা মার্জ্জনা শেষ ক'রে ফেল দাদা, যাও বাড়ি যাও। বউমা আমার ব'সে আছে পথ চেয়ে।

ভোলাই পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অপ্রতিভের মত কেবলই হাসিতে লাগিল। রমণ গোপ অকারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলি, দাঁত মেলে শুধু হাসবি, না কাজ শেষ করে বাড়ি যাবি, তা বল!

ভোলাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘস ঘস শব্দে মেঝে মাজিতে বসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রমণও। জলবাহকেরা হুড় হুড় শব্দে জল ঢালিয়া দিল।

রজনীও আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হ্যারিকেনটি তুলিয়া ধরিয়া বেশ নিবিষ্টচিত্তে প্রতিমাখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর চাঙারির কাপড় খুলিয়া বাহির করিল সোনালী রূপালী লাল সবুজ রাংতার আভরণগুলি। একখানা কাপড় মাটির উপর বিছাইয়া তাহার উপর আভরণগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া ফেলিয়া আঠার মালসাটা টানিয়া লইয়া আঠা মাখাইতে মাখাইতে গুন গুন করিয়া গান ধরিল—

"হাতে দিব বাজুবন্ধ গলাতে সাতনর
চরণে বাজিবে মল ঝমর ঝমর।"

বাহিরে তখন ছেলেরা দুই-এক জন করিয়া জমিতে সুরু করিয়াছে। মালাকারের আগমন-সংবাদ এই রাত্রেও তাহারা কেমন করিয়া পাইয়া গিয়াছে। মণ্ডপের সিঁড়ির দুই ধারে নোটন চৌকিদার কলাগাছ পুঁতিতে আসিয়াছে। সে বলিল, এই দেখ, কলাগাছের পাতায় যদি হাত দেবা, তবে বুঝতে পারবা, হ্যাঁ। বাবুদের ছেলে ব'লে মানব না।

একটি ছোট মেয়ে পূজার ঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, ডাকসাজ দাও, ও মালাকার!

শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া রজনী এক সময় প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিল, ভাগ্ এখান থেকে বলছি, ভাগ্। বাঁজার ঘরে ষাঠের উপদ্রব রে বাবা! মর কেনে তোরা, ম'রে যা সব।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। রজনী, বন্ধু কালী সিংয়ের ঘরে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। কালী সিং নিজে কি একটা তরকারি রান্না করিতেছিল, তাহার গৃহকর্ত্রী রজনীর সেঙাতিনী শ্যামা ও আর একটি মেয়ে রজনীর সম্মুখে বসিয়া কাপড় দেখিতেছে। রজনী মাদুরের উপর খানকয়েক কাপড় লইয়া বসিয়া আছে।

রজনী বলিল, এই জরদা রঙের খানাই তোমাকে মানাবে ভাল মিতেনী। তোমার কালো রঙের উপর খুলবে ভাল।

শ্যামার রং নিকষের মত কালো, কিন্তু কালোর মালিন্যকে জয় করিয়া

তাহার অপরূপ মুখশ্রী এবং দেহসৌষ্ঠব তাহাকে সুন্দর একটি শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। শ্যামা কাপড়খানার ভাঁজ খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে অপর মেয়েটিকে বলিল, কেমন লাগছে দেখ ভাই, বল।

অপর মেয়েটির রং ফরসা। সে শ্যামার বান্ধবী, শুধু শ্যামার নয়, রজনীরও বান্ধবী। সে যেন একটু বিস্ময়ের সহিতই বলিল, হ্যাঁ ভাই, খুব ভাল লাগছে তোকে। মালাকারের চোখ আছে ভাই।

রজনী হাসিয়া একখানা নীলাম্বরী সেই মেয়েটির কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার তোমাকে কেমন লাগে দেখ।

কালী সিং তরকারিটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, এবার কখানা কাপড় বেশি লাগল মিতা?

হাসিয়া রজনী বলিল, বেশি বাড়ে নাই, তিনখানা বেড়েছে এবার। অর্থাৎ এবার নূতন বান্ধবী বাড়িয়াছে তিনটি। কালী সিং হাসিল। নীরবে হাসিতে হাসিতেই সে পরটা তরকারি দুটি পাত্রে সাজাইয়া বলিল, উটা শেষ করিয়ে ফেল।

রজনী বিনাবাক্যব্যয়ে মদের বোতল ও একটা নারিকেলের মালা তক্তাপোষের আড়াল হইতে বাহির করিয়া বসিল। কালী সিং শ্যামাকে বলিল, তুরা যা, খাইয়ে লে। সব দিয়ে দিয়েছি উ ঘরে।

একখানা মাছ-ভাজা মুখে পুরিয়াই রজনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, আরে বাপ রে!

কি হইল? কাঁটা লাগল?

যে মিহি কাঁটা! নেহাৎ কচি মাছ।

কালী সিং আক্ষেপ করিয়া বলিল, আরে ভাই, পাকা মাছ-ই দেশে নাই। মিলছে না। ই কি দেশ রে ভাই!

রজনী মুখের কাঁটাটা আঙুল দিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, আহা একটা মাছ যে এ জানলে নিয়েই আসতাম।

তুমার পুকুরে বড়া মাছ আছে নাকি?

হঠাৎ রজনীর অভিমান হইয়া গেল, সে বলিল, নাঃ, তোমার বাড়ি আমি আর আসব না ভাই মিতে। এই শেষ।

কালী সিং সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, কাহে ভাই? কি দোষ হামার হইল মিতা।

আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার বাড়ি একবার গিয়েছ? বল, ওই কারণ ছুঁয়ে বল।

কালী সিং সাগ্রহে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যাব, জরুর যাব। তুমি সাদি কর, জরুর যাব।

রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া রজনী বলিল, সাদি? বিয়ে? তারপরই সে অকস্মাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

কালী সিং গম্ভীর মুখে আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিল, হাসিয়ো না মিতা, হামি বলছি তুমি সাদি কর। ইস্‌মে সুখ নাই ভাই মিতা।

রজনীর কিন্তু হাসি থামিল না, কালী সিংয়ের আবেগ শেষ হয় নাই, সে আবার বলিল, হাসিয়ো না মিতা। হামার কথার জবাব দাও তুমি, না তো হামি আর কারণ ছোঁবে না।

রজনী গম্ভীর হইয়া বলিল, বল।

কত রোজগার তুমি কর, বল ভাই, সচ বাত বল।

তা তোমার—। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া রজনী বলিল, তা তিনশো টাকা হবে; তা খুব। আতসবাজি, ডাকসাজ—দুয়ে বরং বেশি হবে তো কম নয়।

জমি তুমার কতো ছিল ভাই?

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রজনী বলিল, ছিল তো ভাই ভালই, বিঘে পাঁচিশেক ছিল। জমিদারই সব নীলেম করিয়ে নিলে।

তুমি একা লোক, এই রোজগার; কেনো ভাই খাজনা তুমি দিলে না, বল?

রজনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর সহসা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, চললাম আমি মিতে।

আশ্চর্য্য হইয়া কালী সিং বলিল, কাঁহা যাবে ভাই?

নাঃ উসব ব্যাড়র ব্যাড়র আমার ভাল লাগে না। বলিয়া সে অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল, নেহি মাংতা হ্যায়, এমন মিতে নেহি মাংতা হ্যায়।

সে চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘর হইতে শ্যামা ও তাহার সঙ্গিনী ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কালী সিং অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিল। শ্যামা বলিল, ব'স ব'স। রাগ হ'ল কেন মিতে?

রজনী একটা চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে দর্পিত-কণ্ঠে কহিল, দেখ দেখি, হিসেব চাইছে আমার কাছে? বলছে কিনা বিয়ে কর।

কালী সিং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এবার কহিল, দোষ হইয়েছে হামার, হাঁ, দোষ হইয়েছে। মাফ কর ভাই মিতা।

শ্যামার সঙ্গিনী এবার বলিল, ব'স ব'স, বন্ধুলোকের কথায় রাগ করে না, ব'স।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাও বলিল, ব'স ব'স মিতে, ব'স।

রজনী দর্পের সহিত বসিয়া বলিল, আমার খরচ? বছরে কাপড় লাগে কত? দোব সে আমার খুশি।

কালী সিং সুরাপূর্ণ পাত্র আগাইয়া ধরিয়া বলিল, লেও পিয়ো। পাত্রটা হাতে লইয়া রজনী আবার আরম্ভ করিল, কাপড় না কাপড়—পাঁচসিকে খানা, সে নয় বাবা। হিসেব ক'রে কিনতে হয়, কাকে কোন রঙের কাপড় দিতে হবে। আড়াইটাকা তিনটাকা—

বাধা দিয়া শ্যামা বলিল, নাঃ, সে বলতেই হবে, তোমার মত পছন্দ কারু নাই।

রজনীর মনের উত্তাপ মুহূর্ত্তে শীতল হইয়া গেল।

অনিয়ম, উচ্ছৃংখলতা ও স্বেচ্ছাচারের উন্মত্ত আনন্দের আস্বাদ রজনী যে কেমন করিয়া পাইয়াছিল, তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন ইতিকথা নাই। তবে সে পাইয়াছিল। দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—কারিগরের পাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আছে, নাই কেবল ভাত। অর্থাৎ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনেই তাহাদের সর্ব্বস্ব ব্যয়িত হইয়া গিয়া অন্নের বেলাতেই অভাব ঘটিয়া যায়। অপব্যয়টা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। রজনীরাও বংশানুক্রমে ডাকসাজ ও আতস-বাজির কারিগর। এ উচ্ছৃংখলতাটাও বংশানুক্রমিক। নিয়মের সূত্র ধরিয়া কল্পনা করা ইতিহাস নয়, ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়াই নিয়মের সূত্রটা লোকে উপলব্ধি করিয়াছে। রজনীর পিতামহ পিতা সকলেই ছিল নেশায় এবং নারীতে আসক্ত, রজনীরও তাই। তাহার উপর নিতান্ত অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া অবাধ জীবনে সে এই ধারাতেই চলিয়াছে, বিবাহ করে নাই,

সে প্রবৃত্তিও নাই। উপার্জ্জন আছে, সঞ্চয় নাই; পৈত্রিক সম্পত্তিগুলিও একে একে নামমাত্র ঋণ বা খাজনা বাকির দায়ে নিঃশেষিত হইতে বসিয়াছে। রজনীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। হাতে অর্থ আসিলেই উন্মত্ত অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। সে অর্থ নিঃশেষিত করিয়া নিঃসম্বল হইয়া ফিরিয়া সে আবার কাজে লাগে। তবে কাজ তাহার খুব ভাল। তাহার হাতের ডাকসাজের মত এমন ডাকসাজ কাহারও হাতে বাহির হয় না। আতসবাজিতেও সে অপরাজেয়। তাহার ফানুস আজও জ্বলিয়া যাইতে কেহ দেখে নাই, রাত্রির আকাশের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি মিলাইয়া যায়। হাউইবাজির আকাশ কুসুমের রং এত বিচিত্র কাহারও হয় না।

রজনী অহঙ্কার করিয়া বলে, হাত আর চোখ—এ থাকতে তোয়াক্কা কারু করি না। মা ভৈ!

কিন্তু অকস্মাৎ রজনীর সে দম্ভ একদা চূর্ণ হইয়া গেল। হাত চোখ এমন কি সমস্ত দেহ সুস্থ নীরোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার ব্যবসা-উপার্জ্জন সব বন্ধ হইয়া গেল। স্বরাজ স্বরাজ করিয়া সমস্ত দেশটা যেন পাগল হইয়া উঠিল। ছেলেরা দলে দলে জেলে যাইতেছে; পুলিশ আসিয়া ঘরবাড়ি তছনছ করিয়া দেয়; ছেলেদের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়ে, তবু তাহারা বন্দেমাতরম্ বলিতে ছাড়ে না; শুধু বন্দেমাতরম্ই নয়, আরও কত বলে, রজনী সে বুঝিতে পারে না। রজনীর রক্তও টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে। মন উত্তেজনায় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে।

কিন্তু সহসা সে একদিন উপলব্ধি করিল, এই সমস্তের ফলে সর্ব্বনাশ হইয়া গেছে তাহারই। ভাদ্র মাসে শারদীয়া পূজার ডাকসাজ এবং আতসবাজির বায়না আনিতে রামনগরের বাবুদের বাড়িতে গিয়া শুনিল, এবার বায়না হইবে না. ডাকসাজ আতসবাজি দুইই বন্ধ।

বাবু বলিলেন, ও বিলিতী র‍্যাংতা চুমকির কাজ চলবে না। আমরা খদ্দর দিয়ে প্রতিমা সাজাব। ও আতসবাজিও চলবে না।

রজনী আকাশ হইতে পড়িল। তারপর একে একে সে সমস্ত খরিদ্দারের বাড়ি হইতে ওই একই জবাব লইয়া বাড়ি আসিয়া একেবারে হতাশায় যেন ভাঙিয়া পড়িল। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত দোকানে ধার জমিয়া আছে। এই আশ্বিনের কাজ করিয়া সে সমস্ত শোধ করিতে হইবে। তাহার পর ভবিষ্যৎ। তাহার চরিত্রে চিন্তা করার অভ্যাস নাই, আজ এই আকস্মিক

দুশ্চিন্তায় সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। বারবার সে এই আন্দোলনকে অভিসম্পাত দিল!

হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরিটা লইয়া আপন মনেই এক টুকরা সোলা বিনা কারণে চাঁচিয়া ছুলিয়া কাটিয়া ফেলিতেছিল আর ভাবিতেছিল ওই কথা। থাকিতে থাকিতে সহসা চোখ দুইটা তাহার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একি! বাঃ, এ যে শুধু সোলা হইতেই সুন্দর একখানি আভরণ গড়িয়া উঠিয়াছে! দেখিতে তো রাংতা-মোড়া সাজ হইতে খারাপ লাগে না! হাতীর দাঁতের গহনার মত সুন্দর শুভ্র। ইহাকে যদি আরও ভাল করিয়া পালিশ করা যায়, তবে তো চমৎকার হয়। কল্পনানেত্রে আপাদ-মস্তক শুভ্র আভরণে সজ্জিতা একখানি দশভূজা প্রতিমা ভাসিয়া উঠিল। রঙিন বিদেশী কাপড়ের পরিবর্ত্তে দেশী খদ্দর! চমৎকার! শিল্পীর দৃষ্টি লইয়া সেই কল্পনার প্রতিমাখানির বারবার সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এমন সুন্দর মূর্ত্তি কখনও কেহ দেখে নাই। লাল নীল খদ্দরের প্রান্তে সাদা সোলার পাড়, সর্ব্বাঙ্গে শুভ্র আলোর মত আভরণ। রজনী লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। পরদিন প্রাতঃকালেই সে আবার রামনগরে আসিয়া বাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন, কি?

হাতজোড় করিয়া রজনী বলিল, হুজুর, দেশী ডাকসাজেই আমি প্রতিমা সাজিয়ে দোব। পছন্দ না হয় দাম নোব না, সঙ্গে সঙ্গে খুলে দোব।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন, বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। দেশী ডাকসাজ কি ক'রে হবে?

হুজুর, শুধু সোলার কাজ, হাতীর দাঁতের মত সাদা সাজ। বলিয়া সে সেই আভরণের নমুনাটি বাবুর সম্মুখে ধরিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বাবু বলিলেন, দেখে তো ভালই লাগছে।

হুজুর, দেশী কাজই একটা হোক, দেখুন পরখ ক'রে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বাবু বলিলেন, বেশ। কিন্তু যে কথা তুমি বলেছ, সেই কথাই রইল। কাজ দেখব, পছন্দ না হ'লে খুলে ফেলে দোব। পছন্দ হয়, দাম তো পাবেই, বকশিশও পাবে। বায়না এক পয়সাও পাবে না।

রজনী উৎসাহভরে বলিল, তাই হবে হুজুর। কিন্তু ঐ কথা একখানা চিঠিতে লিখে দেন হুজুর. তা হ'লে ঐ দেখিয়ে, ঐ সর্ত্তেই আমি অন্য বাড়িতে সাজ দেবার কথা কয়ে আসব।

বাবু আপত্তি করিলেন না, সানন্দেই পত্র লিখিয়া বলিলেন, পঞ্চমীর দিন এলে এবার হবে না। চতুর্থীর দিন প্রতিমা সাজান শেষ করতে হবে। কারণ, পছন্দ না হ'লে অন্য রকমে প্রতিমা সাজাব আমরা।

রজনী সানন্দে সম্মতি দিয়া পত্র লইয়া গ্রাম গ্রামান্তরে পূজাবাড়ির সাজ সরবরাহের বরাত লইতে বাহির হইল। ফিরিল সে আশাতীত আনন্দ লইয়া, এবার কাজ পাইয়াছে অনেক বেশি; কিন্তু ঐ সর্ত্তে।

বাড়িতে আসিয়া আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা কাটিয়া যাইবামাত্র সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। সে করিয়াছে কি? বরাত তো লইয়াছে, কিন্তু বায়না যে একটা পয়সাও পায় নাই। দেড়শত দুইশত টাকার কাজ করিতে অন্ততপক্ষে পঁচিশ ত্রিশ টাকার জিনিস চাই। না, আরও বেশি, রঙিন কাপড়ই যে চাই অনেকটা। কাপড় না হয় দোকানে ধারে মিলিবে, কাপড়ের দোকানের একজন মোটা খরিদ্দার সে, দোকানী তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিবে না। কিন্তু সোলা এবং অন্য জিনিসগুলির কি হইবে? সম্মুখেই শ্রীপুরে নাগ-পঞ্চমীর মেলা, সোলার আমদানি ঐখানেই। সোলার টাকার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা আজ তাহার মনে হইল, ঘরে মা ভগ্নী কি স্ত্রী থাকিলে আজ তাহাকে ভাবিতে হইত না। গায়ের গহনা তাহারা হাসিমুখেই খুলিয়া দিত। অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়া সে মিতা কালী সিংয়ের কাছে আসিয়া সমস্ত বলিয়া বলিল, তিরিশটি টাকা তোমাকে ধার দিতেই হবে ভাই মিতে। এই পুজোতেই তোমাকে শোধ দোব!

কালী সিং বিনা আপত্তিতে টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি দিলাম চুপসে, তুমি দিবে হামাকে চুপসে। কোইকে বলিয়ো না মিতা, শ্যামাকে কভি বলিয়ো না।

রজনী হাসিয়া বলিল, কেন কেড়ে নেবে নাকি?

জরুর লিবে ভাই। আওর যদি জানে ভাই, টাকা হামি লুকইয়ে রাখি, তবে কোন জানে ভাই, এক রোজ খুন করিয়ে দিবে না!

রজনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বল কি মিতে?

ঠিক বলি ভাই। তুমার কারবার ই লোকের সাথ দু চার রোজকে। তুমি জানো না, উ জাতই এমন আছে।

ছেড়ে দাও না কেন? ঝাঁটা মেরে দূর কর।

পারি না মিতা, পারি না। কালী সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রজনী গৌরবভরেই বলিল, দেখ ভাই, আমার তা হ'লে বাহাদুরি আছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

কালী সিং চুপ করিয়া তাহার সম্মুখের রাস্তাটার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

মেলাতে আসিয়া সে একটি একটি করিয়া বাছিয়া আপনার মনোমত সোলা দিয়া প্রকাণ্ড একটা আঁটি বাঁধিয়া ফেলিল। সোলা এবার বিক্রি নাই বলিলেই চলে, কাজেই দোকানদারও আপত্তি করিল না। দাম দর শেষ করিয়া সে দুইটা টাকা বায়না দিয়া বলিল, আমার মাল আঁটি বাঁধাই রইল ভাই দোকানে। কাল সকালে বাকি মিটিয়ে নিয়ে যাব।

এখনও অনেক জিনিস কিনিতে বাকি, সেগুলি কিনিতে হইবে। রং, মিহি সুতা, গোটা দুয়েক ধারাল ছুরি, কাঁচি—মনে মনে বাকি জিনিসগুলির হিসাব করিতে করিতেই সে বাহির হইয়া পড়িল। দুই পাশে সারি সারি দোকান, পথে আনন্দোন্মত্ত জনতা, হাসি, চীৎকার, কলরব। রজনী জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল।

গুর—গুর—গুর—ঠনাঠন ঠনাঠন। চলে আও, চলে আও। এক রুপেয়ামে দো রুপেয়া—নসীবকা খেল। চলে আও।

জুয়ার আড্ডা। জুয়ার আসর ঘিরিয়া লোকের কি ভিড়! খেলাটা রজনীর দেখিতে ভাল লাগে। রজনী ভিড়ের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া গেল।

বলিহারি বলিহারি, লোকটা খেলোয়াড় বটে! হাতখানা জুয়ার ঘুঁটি লইয়া খেলিতেছে, কেউটের লেজের মত ক্ষিপ্র বঙ্কিম গতিতে। একটা ঘর মারিয়া বারবার চলিয়াছে। ঘরটা বাঁধিয়া একজন দানের পর দান ধরিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ একটা তীব্র গন্ধে রজনীর নাসারন্ধ্র ভরিয়া উঠিল। মদের গন্ধ। মুহূর্ত্তে রজনীর বুকের মধ্যে একটা অদম্য তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল। সে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া এক বিচিত্র অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এসবের গোপন পথঘাট রজনীর অবিদিত নয়। সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া একটা মাংস-ডিম-পরটার দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল।

গরম সরবৎ দেবেন তো একটা।

দোকানদার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া বলিল, ডবল দাম কিন্তু।

রজনী হাসিয়া বলিল, নাম জানি আর দাম জানি না? সে জানি।

একটা পর্দ্দা-ঘেরা ঘর দেখাইয়া দিয়া দোকানী বলিল, বসুন গিয়ে। খাবার কি দোব?

পর্দ্দাটা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে রজনী বলিল, পোয়াখানেক মাংস, আর—আর দুটো ডিম, ব্যাস।

দোকান হইতে যখন সে বাহির হইল, তখন সমস্ত মেলাটা আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে, রজনীর মনে হইল, সব যেন হাসিতেছে, সমস্ত কিছু হইতে দীপ্তি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে আগাইয়া চলিল। দুই ধারে দোকানের পর দোকান চলিয়াছে, আলোকোজ্জ্বল পণ্যসম্ভার যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে।

সহসা রজনীর দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, কিন্তু বেমানান বেশভূষায় কি বিশ্রীই না লাগিতেছে! রজনী দৃষ্টি ফিরাইল। পাশের মেয়েটা কদর্য্য দেখিতে। তারপর ও মেয়েটিও তাই। তাহার পাশের মেয়েটির রুচি মন্দ নয়, বেশ মানানসই বেশভূষাই সে করিয়াছে।

কখন সে ঘুরিতে ঘুরিতে মেলার রূপোপজীবিনীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রূপ ও সজ্জার কদর্য্যতা রজনীর ভাল লাগিল না, সে ফিরিল। সহসা কি খেয়াল হইল, সে প্রথম মেয়েটির নিকটে আসিয়া বলিল, ওই বেগুনি রঙের কাপড়টা ছাড়্‌গে। বিশ্রী লাগছে দেখতে। একখানা চাঁপাফুল রঙের—

মেয়েটা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, বল কি নাগর? তা দাও না একখানা কিনে। দিয়ে দেখ না কেমন লাগে।

পাশের মেয়েগুলি ও সম্মুখের জনতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রজনীর মাথার ভিতরটা চন চন করিয়া উঠিল, একটা দর্পিত ভঙ্গিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া হন হন শব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরেই সে আবার ফিরিল, তাহার কাঁধে একটা বোঁচকা।

অল্পক্ষণ পরেই রূপোপজীবিনীর পল্লীটা মুখর হইয়া উঠিল, তাহারা গোল হইয়া বসিয়া রজনীর গুণগান আরম্ভ করিল, সকলের হাতে একখানা করিয়া রঙিন শাড়ি। সেই মেয়েটি চাঁপাফুলের রঙের কাপড় পরিয়া রজনীর হাতখানি ধরিয়া বসিয়া আছে। মধ্যস্থলে রজনী বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

আলোগুলি নিভিতেছিল, প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। গত রাত্রের উৎসব-আয়োজনের অবশেষ আবর্জ্জনা হইয়া সমস্ত মেলাটাকে কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। উচ্ছিষ্টে আবর্জ্জনায় পথঘাট পরিপূর্ণ, একটা বাসি দুর্গন্ধে পেটের ভিতর মোচড় দিয়া উঠে। ভাদ্রের সজল বাতাসে মানুষের গায়ে শীত ধরিয়া উঠিতেছে. শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রজনী উঠিয়া বসিল। একটা গাছতলায় সে শুইয়া আছে। সমস্ত কাপড়-চোপড় কাদায় জলে কালো এবং ভারী হইয়া উঠিয়াছে। গালে হাত দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে সব তাহার মনে হইল। একবার কোমরের গেঁজেটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। গেঁজেটা আছে, কিন্তু শূন্য; কঠিন গোলাকার বস্তু একটাও হাতে ঠেকিল না।

উপায়? শূন্যদৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাথা এখনও ঘুরিতেছে, পেটে অসহ্য ক্ষুধা। সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সে ভাবিতেছিল, উপায়? বাড়ি ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু তারপর? আর টাকা কোথায় মিলিবে? সোলা শহরে গেলেও মিলিবে, কিন্তু টাকা? এই মেলা হইতেই কোন দিকে চলিয়া গেলে হয় না? যে কোন দিকে? কতক্ষণ পর তীব্র রৌদ্রে শরীর তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল। পরিষ্কার ভাদ্রের আকাশে সূর্য্য যেন আজ জ্বলিতেছে। রজনী উঠিয়া দাঁড়াইল। পথ আবার লোকজনে ভরিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে মেয়ে ছেলে মনসাতলায় পূজা দিতে চলিয়াছে। একটা পথের বাঁকে চলন্ত জনস্রোত অত্যন্ত মন্থর, পথের সঙ্কীর্ণতা হেতু ভিড়ও অসম্ভব। সম্মুখেই একদল পূজার্থিনী স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে মেয়ে। সহসা রজনীর চোখ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল, দাঁতে দাঁতে আপনা আপনি যেন মৃদু ঘর্ষণ করিয়া উঠিল। কোলের কাছেই একটি ছোট মেয়ে, গলায় একগাছি সোনার বিছে-হার। হাতের আঙুলে আঙুলে সে সজোরে ঘষিতে আরম্ভ করিল।

বাঁকটা ঘুরিয়াই দুইটা পথ। রজনী চট করিয়া একটা পথে ঘুরিয়া গেল। পিছনে শিশুকণ্ঠের একটা আর্ত্তস্বর সমস্ত উন্মত্ত কলরবকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল, মাগো, আমার হার! ওগো, আমার হার! আমার হার!

পথের পর পথ ফিরিয়া রজনী মেলার প্রান্তে নির্জ্জন স্থানে আসিয়া একটা গাছতলায় হাঁপাইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে. বুকের ভিতর একটা সীমাহীন অসহ্য যন্ত্রণা।

চতুর্থীর দিন সে প্রতিমা সাজাইতে বসিল, বাবু নিজে আসিয়া সম্মুখে চেয়ার লইয়া বসিলেন। আপাদমস্তক অমলধবল আভরণের দীপ্তিতে প্রতিমা যেন হাসিয়া উঠিল। মাথায় শুভ্র মুকুটের উপর একটি করিয়া নীলকণ্ঠ পাখীর নীল পালক, কাঁধ হইতে প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিয়া শরতের শাদা মেঘের মত আঁচলা, কটিতট হইতে লাল খদ্দরের কাপড়ের প্রান্তদেশে রূপার পাড়ের মত শাদা পাড়, জমির মধ্যেও ফুল, সমস্ত কারুকার্য্যের সমন্বয়ে রচিত আভরণ ও সজ্জায় প্রতিমার রূপ ঝলমল করিয়া উঠিল। বাহিরে ছেলের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিমার সজ্জা দেখিতেছিল। কয়টি ছোট ছেলে ডাক চুরির চেষ্টায় ঘুর ঘুর করিতেছে। একটি ছোট মেয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে কাতর অনুনয়ে বলিতেছিল, ডাক দাও, মালাকার! ওই এমনি হার দাও!

বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এঃ হে হে! করলে কি? হাত তোমার কাঁপছে কেন হে?

মেয়েটি তখনও বলিতেছে, হার দাও মালাকার! মালাকার!

শেষ পর্য্যন্ত বাবু পরম পরিতুষ্ট হইলেন, বলিলেন, তোমার কথা আমি খবরের কাগজে লিখব। প্রতিমার ফোটো তুলে সাজের নমুনা আমি ছাপিয়ে দোব। তুমি একজন উঁচুদরের কারিগর, যাকে বলে শিল্পী।

অন্যবার রজনী পনরো টাকা বিদায় পাইত, এবার বাবু তাহার হাতে পঁচিশ টাকার নোট তুলিয়া দিলেন।

সমস্ত প্রতিমা শেষ করিয়া কালী সিংয়ের ঘরে আসিয়া রজনী তাহার টাকা কয়টি গণিয়া দিল। কালী সিং বলিল, শ্যামা ভারী রাগ করিয়েছে মিতা।

রজনী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিতে চাহিল. কালী সিং বলিল, উ রোজ তুমি ওখানে আইলে ভাই, এখানে আইলে না। তুমার বন্ধুলোকভি আসিয়েছিল।

রজনী উত্তর দিবার পূর্ব্বে শ্যামাই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কি গো মিতে, ভুলে গেলে নাকি?

তাই কি ভুলতে পারি? রজনী ম্লান হাসি হাসিল।

তবে? সে দিন এলে না, এখনও কাপড় পেলাম না আমরা!

কাপড় এবার আর পারলাম না মিতেনী। আর পারবও না।—সে হাতজোড় করিল।

বটে, তামাসা হচ্ছে বুঝি! দেখি, তোমার বোঁচকা দেখি!—শ্যামা নিজেই বোঁচকাটা টানিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। সবিস্ময়ে বলিল, একি, এ যে সব ছোট ছেলেমেয়েদের জামা! এ কি হবে?

রজনী হাসিয়া বলিল, এবার থেকে মামণি খুকুমণিদের সাজাব মিতেনী! তোমাদের তো সাজালাম অনেক দিন। বলিয়া সে বিচিত্রবর্ণের ঝলমলে ছোট ছোট জামাগুলি বহুমূল্য বস্তুর মত সযত্নে গুছাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

কাঁটা

আণুবীক্ষণিক পর্য্যবেক্ষণে দেহের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবকোষগুলি দেখা যায়, সামান্যও বৃহৎ হইয়া ওঠে, কিন্তু মন দেখা যায় না; দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া সুদূর আকাশে চক্ষুর অগোচর গ্রহ উপগ্রহ রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়—কিন্তু কাল অথবা কালের ভগ্নাংশ লগ্নক্ষণকে দেখা যায় না। মানুষের মন ও লগ্নক্ষণ দুই অদৃশ্য। ক্ষণের আবার অদৃষ্টের সঙ্গে গতি। কোন অঘটন ঘটিলে ওই দুইটার উপরই সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। পরের ঘাড়ে অপরাধ চাপাইতে পারিলে আমরা বেদনার মধ্যেও সান্ত্বনা লাভ করি। কিন্তু চারু ও কার্ত্তিকের মিলিত জীবনের ব্যর্থতার বেদনার অভিশাপ যে কাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইবার—একথা ভাবিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না। শুভদৃষ্টির ক্ষণ তো পরম শুভই ছিল এবং সস্মিত পুলকিত দৃষ্টিতেই তো দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল। তবে কি মন—দুজনের মন এজন্য দায়ী? কিন্তু না, মনের উপরও তো দায়িত্ব চাপাইবার নয়, একই গ্রামের একই পাড়ার একটি ছেলে ও মেয়ে, সম্বন্ধও বহুকাল হইতেই হইয়াছিল—কতশতবার নির্জ্জন গ্রাম্যপথে সলজ্জ হাস্য বিনিময়ের মধ্য দিয়া গোপনে তাহাদের মনোভাবের আদান প্রদান হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। সুতরাং রূপ অথবা গুণ এ দুইটার কোনটার জন্যই তো কাহারও মন বিরূপ হইবার কথা নয়। তবুও আশ্চর্য্য এই, মিলনের পরই পদে পদে জীবনে ছন্দ কাটিয়া শুধু অস্বচ্ছন্দই নয়, গভীর গ্লানিকর হইয়া উঠিল। একজন যেন অত্যন্ত কড়াটানে বেসুরে বাঁধা সেতারের তার—অপরজন তীরের ফলা, সংস্পর্শে ঝঙ্কারের বদলে টঙ্কারই ওঠে—মধ্যে মধ্যে তার কাটিয়াও যায়। চারুর ব্যবহারে প্রণয় দূরের কথা বিনয় পর্য্যন্ত নাই—আর কার্ত্তিকেরও তাই; প্রেম তো নাই-ই ক্ষমা পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছে।

জীবনের প্রথম মিলন দিনেই ইহার সূত্রপাত।

ফুলশয্যার দিন বেলা দশটার সময় কার্ত্তিক আসিয়া বলিল, দিদি, আজ আবার একটা হাঙ্গামায় পড়লাম। আমাদের 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'র আজ একটা সভা হবে—আমাকে একটা অভিনন্দন দেবে—বউকেও যেতে হবে।

দিদিই সংসারে কার্ত্তিকের অভিভাবিকা—তিনিই সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, কার্ত্তিকের প্রতি তাঁহার স্নেহ অপরিসীম। দিদির মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, নিজে যা করছিস করছিস, আবার ঘরের বউকে নিয়ে কেন? ওতে লক্ষ্মী চঞ্চল হন। আর বউমানুষ—

কার্ত্তিক হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, বউমানুষ! এটা তুমি খুব ভাল বলেছ দিদি। কিন্তু তারা বলছে—তাদের গাঁয়ের মেয়ে চারু।

দিদি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কিন্তু আমার ঘরের বউ তো!

কার্ত্তিক বলিল, একদিন বই তো নয় দিদি।

দিদি দৃঢ় আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, না।

কার্ত্তিক তখনকার মত চলিয়া গেল, বুঝিল এখন সুবিধা হইবে না।

দিদি বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দেখ বউ; তুমি যেন আবার ওর কথায় নেচো না, তুমি ঘরের লক্ষ্মী--তুমি যদি ওর ওই উড়নচণ্ডী অভ্যেস কর—তবে ঘরে লক্ষ্মী আর থাকবে না!

চারু নীরব হইয়া রহিল।

অপরাহ্ণে কার্ত্তিক আবার আসিয়া ধরিল—দিদি প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, সে আমি বলতে পারব না কার্ত্তিক।

কার্ত্তিক অবশেষে অভিমান করিল। এটি তাহার অমোঘ অস্ত্র। দিদি এবার বলিলেন, তবে নিয়ে যা। কিন্তু আর কখনও—

সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

দিদি পা দুটা সরাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, পা ছুঁতে হবে না।

তারপর উঠিয়া চারুকে ডাকিয়া বলিলেন, ও বউ, যাও একবার ভাই। একখানা ঢাকাই খদ্দরের শাড়ী পরে নাও।

কার্ত্তিক বলিল, এত সব গয়নাগাঁটিও খুলে দাও দিদি।

দিদি বলিলেন, না গয়না খুলবে কি—ওসব অলক্ষণের কথা বলো না, তা হ'লে যেতে দেব না আমি।

কার্ত্তিক আর আপত্তি করিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বধূর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া বলিল, কি করছে কি? এই পোষাকের বাহার করতে গিয়েই মেয়েরা গেল। ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাবে। দিদি! দেখ না একবার।

দিদি বলিলেন. তুই দেখ না। ভাঁড়ার ছেড়ে আমার এখন মরবার অবসর নাই।

কার্ত্তিক ব্যস্ত হইয়া বধূর সন্ধানে আসিয়া দেখিল—চারু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ঘরের ছবিগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া আপন রুচি অনুসারে নূতন করিয়া সাজাইতেছে। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, কাপড় ছাড় নি যে?

মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া চারু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

কেন?

চারু কলাবউয়ের মত চুপ করিয়া খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কার্ত্তিক বলিল, বুঝতে পার নি নাকি? কাপড় ছেড়ে নাও, মিটিংয়ে যেতে হবে।

চারু আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না!

কার্ত্তিক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, কি বলছ, স্পষ্ট ক'রে বল বাপু!

চারু এবার স্ফুটকণ্ঠেই বলিল, যাব না।

যাব না!

না।

কেন?

চারু কোন উত্তর দিল না, যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুমাত্র চাঞ্চল্য তাহার দেখা গেল না।

কার্ত্তিক বলিল বলি, যাবে না কেন শুনি?

চারু এবারও কোন উত্তর দিল না। কার্ত্তিকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া দিদি উপরে আসিয়া বলিলেন, কি হ'ল কি?

কার্ত্তিক বলিল, যাবে না?

দিদি বলিলেন, যাও বউ, কার্ত্তিক বলছে—আজকের মত যাও।

চারু কিন্তু অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেষ পর্য্যন্ত কার্ত্তিক রাগ করিয়াই চলিয়া গেল; দিদিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিও বলিলেন, না, এতখানি একগুঁয়েমী ভাল নয় বউ। স্বামীর সাধ—তা ছাড়া মিটিংয়েও সব গাঁয়েরই লোক; তুমিও গাঁয়ের মেয়ে। কি এমন দোষ ছিল?

চারু বলিল, না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কার্ত্তিক ফিরিল না। এই অল্প বয়সেই সে এই অঞ্চলের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। এখানকার 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'র প্রাণস্বরূপ সে, এ অঞ্চলের বিপদে-আপদে তাহার কর্ম্মঠ কল্যাণময় হাত সর্ব্বদাই প্রসারিত। সে সুবক্তা, সু-অভিনেতা; লোকে তাহাকে ভালবাসে, সম্মান করে, তাহার ভবিষ্যৎ বৃহত্তর গৌরব কল্পনা করিয়া তাহার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। সেই জন্যই তাহার বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া তাহার সেবাব্রতের সমকর্ম্মিগণ তাহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করিল, তাহাতে জনসমাগম হইয়াছিল প্রচুর। সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। ফুলশয্যার আয়োজন করিয়া দিদি চারুকে লইয়া বসিয়াছিলেন। প্রতিবেশীর দল শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গেছে।

দিদি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এই বাতিকেই কার্ত্তিকের মাথাটি খাওয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত হয় তো সম্পত্তি-টম্পত্তি কিছুই থাকবে না। না দেখলে কখনও সম্পত্তি থাকে?

চারু চুপ করিয়া রহিল, হাজার হইলেও সে বউমানুষ।

দিদি আবার বলিলেন, আমি তো পারলাম না ভাই! তুই এইবার ওর রাশটা টেনে ধর ভাই বউ।

চারু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, লোকে আপনার ভাইয়ের নাম কি দিয়েছে জানেন?

দিদি হাসিয়া বলিলেন, কি?

দিদির নিধি।

দিদির চোখ সজল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, নিধিই তো আমার বটে চারু! ও ছাড়া আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে আছে বল।

কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়। ফুলশয্যার আচার অনুষ্ঠান শেষ হইতে একটা বাজিয়া গেল। ঘর নির্জ্জন হইলে কার্ত্তিক সভায়-পাওয়া ফুলের মালাখানি পরাইয়া দিল চারুর গলায়। চারু সঙ্গে সঙ্গে মালাখানি খুলিয়া দেওয়ালের একটা পেরেকে ঝুলাইয়া দিল। কার্ত্তিক বলিল, খুল্‌লে কেন?

আজ ফুলশয্যা—

চারু বলিল, কেন? বাকি রাত্রিটাও সভায় থাকলে তো পারতে।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটার কথা কার্ত্তিকের মনে পড়িয়া গেল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি এমন মানুষ কেন বল তো?

চারু উত্তর দিল, ভগবান তো সকলকে মহাত্মা ক'রে গড়েন না।

কার্ত্তিক আর কোন কথা বলিল না। সে জামা-গেঞ্জিটা খুলিয়া ফেলিয়া বিছানায় গিয়া শুইল। চারু আহ্বানের অপেক্ষা করিল না—সেও আপনার স্থানটি অধিকার করিয়া কার্ত্তিকের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

এমনি করিয়াই বিরোধ আরম্ভ হইল।

অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এইটুকু যে, বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী স্বামীর গৌরব এবং মহত্ত্বের জন্য চারুর মনে গোপন অহঙ্কার ছিল। সে কল্পনা করিত অনেক কিছু, এমন কি সে তাহার সখীদের স্বামীভাগ্যকে এই গৌরবে করুণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে।

যাক্, এমনি করিয়া কল্পনাবিরোধী—এমন কি অন্তরের সত্য-বিরোধী মিথ্যা হেতুকে অবলম্বন করিয়া যে বিরোধ ফুলশয্যার রাত্রে আরম্ভ হইল, সে কিন্তু মিথ্যা হইল না—তাসের ঘরের মতই একদিন সে ভাঙিয়া পড়িল না, দিন দিন সে সামান্য হইতে বৃহৎ হইয়া উঠিল।

মাস দুয়েক পর!

কয়েক দিন হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেছে। দিদি সেদিন কার্ত্তিককে বলিলেন, দেখ ভাই আমার তো আর সহ্য হয় না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কার্ত্তিক বলিল, কি হ'ল কি?

এ অশান্তি যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না ভাই। তা ছাড়া, লোকে যে আমাকেই দোষ দিচ্ছে, বলছে—দিদির উস্কানিতেই কার্ত্তিক এমন করছে। নইলে—

অসহিষ্ণু কার্ত্তিক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, কে? কে, বলে কে একথা?

কার নাম করব বল? বলছে সবাই! আর বলবে নাই বা—

আবার কার্ত্তিক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, সবাই কক্ষণো বলে না, বলতে পারে না। বলে মাত্র কয়েকজন লোক! তারা যে কে সে কথাও আমি জানি—বলে ওর বাপ-মায়ে।

দিদি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না—

কার্ত্তিক বলিল, মিথ্যে দিয়ে সত্যি ঢাকতে যেও না দিদি। ছি, তুমি এমন হবে তা আমি ভাবি নি। তোমার জন্যেই আজ এতটা হতে হ'ল—তুমি যদি শক্ত হ'তে—

কথাটা দিদির গায়ে বড়ই বাজিল—তিনিও এবার ঝাঁঝ দিয়া বলিলেন, আমার জন্যে?

হ্যাঁ, তোমার জন্যে।

কার্ত্তিক আর অপেক্ষা করিল না, সে হন হন করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। দিদি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চারু আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, এতবড় কথাটা আপনি কি ব'লে লাগালেন দিদি?

অশ্রুপ্লাবিত মুখেই দিদি বলিলেন, কি লাগালাম বউ?

কেন আমার বাপ-মা কবে কি বলেছেন, বলুন!

সে কথা তো আমি বলি নি বউ!

বলেন নি? বেশ তবে আমিই মিথ্যেবাদী—আপনারা তো আর মিথ্যেবাদী হতে পারেন না! আমার বাপ-মায়ের নাম দিয়ে কিন্তু সত্যিকথাটাই আপনি বলেছেন—আপনার আস্কারা পেয়েই—

কি? কি? কি বললে তুমি বউ?

বউ আর দাঁড়াইল না—সেও হন হন করিয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দিদি বসিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ পাকা-বাঁধানো মেঝের উপর নির্ম্মমভাবে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিলেন—এই নে—এই নে—এই নে!

কপাল ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত গড়াইয়া তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ ভাসাইয়া দিল। সেই রক্তাক্ত মুখেই সমস্ত দিনটা তিনি পড়িয়া রহিলেন।

একটা প্রজ্বলিত ঘরের আগুনে অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়ায় আর একটা ঘরে লাগিয়া গেল।

সমস্ত গ্রাম দিদির অপরাধের কথায় মুখরিত হইয়া উঠিল। সে অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন ছিল না, অপরাধ তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

দিদি বলিলেন, আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও ভাই কার্ত্তিক, আমার সংসার করার সাধ মিটেছে।

কার্ত্তিক বলিল, আমার ইচ্ছে করছে কি জান দিদি—ইচ্ছে করছে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

দিদি আর কোন কথা বলিলেন না। তিনি নীরবে গিয়া ঘরে শুইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন অন্নজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। কার্ত্তিক সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিতেই চারুই আজ প্রথম কথা কহিয়া বলিল, দিদি আজ সমস্ত দিন খান নি।

বিরক্তিভরে কার্ত্তিক বলিল, সে আর আমি কি করব?

চারু বলিল, তুমি বল খেতে।

কার্ত্তিক বলিল. উঃ, কুক্ষণেই আমি বিয়ে করেছিলাম।

চারু ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কার্ত্তিক বলিল, আর ফ্যাচ ক'রে কেঁদো না বাপু। মেয়েদের ওই হ'ল সম্বল।

চারু এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বেশ তো আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না। আজই আমার বাবা আসবেন নিতে।

আসিবেন নয়—সেই মুহূর্ত্তেই চারুর বাবা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, কই, কার্ত্তিক কই?

কার্ত্তিক অপ্রসন্নমুখেই আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কোন আহ্বান করিল না—বসিতে পর্য্যন্ত বলিল না।

চারুর পিতা বলিলেন, চারুকে একবার পাঠিয়ে দিতে হবে বাবা।

কার্ত্তিক চুপ করিয়া রহিল।

তিনি আবার বলিলেন, নানা অশান্তি হচ্ছে ওকে নিয়ে, দিনকতক পাঠিয়েই দাও।

অ বউ—তাউইমশাইকে বসতে আসন দাও। ছি-ছি-ছি কার্ত্তিক, তোমারও কি এই জ্ঞান হচ্ছে দিন দিন?

দিদি কখন দাওয়ার উপর বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

চারুর পিতাই লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না-না, থাক থাক।

কার্ত্তিক এবার তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিল।

দিদি বলিলেন. বউয়ের যাওয়া তো এখন হবে না তাউইমশায়!

কেন?

এই অশান্তি মাথায় ক'রে যাওয়া ঠিক হবে না, আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন।

কিন্তু না সরে গেলেও তো অশান্তি মিটবে বলে মনে হয় না। আমি একবার নিয়ে যাব মা।

শেষের কথা কয়টায় দৃঢ়তার একটা সুর বাজিতেছিল। দিদি উত্তর দিলেন, আমি এখন পাঠাব না তাউইমশায়, নিয়ে যাবেন জোর ক'রে নিয়ে যান।

চারুর পিতা আর কথা বলিলেন না—রুষ্ট হইয়াই উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে চারু বলিল, আমাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত। ঘরে শান্তি হ'ত।

কার্ত্তিক বলিল, ত্যাগ করবার জন্যে তো কেউ বিবাহ করে না।

চারু বলিল, করে বৈকি। মহাপুরুষে করে, বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ—এঁরা তো সবাই তাই করেছেন!

কার্ত্তিক স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ বিষ বটে তোমার মুখের। ধন্য তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দিদিকে পাওয়া গেল না। কার্ত্তিক ব্যাকুল হইয়া গ্রামের সমস্ত পুকুর-ঘাট খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার বন্ধু এবং অনুগত জনের অভাব ছিল না, চারিদিকে লোক ছুটিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কার্ত্তিক হতাশ হইয়া ফিরিল। বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে বালকের মতই কাঁদিতেছিল। চারুও কাঁদিতেছিল। ঠিক এই সময় বাউড়ীদের সতীশ কার্ত্তিককে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। দিদির পত্র। কার্ত্তিক ব্যাকুলভাবে পড়িল।

"কার্ত্তিক ভাই, দুঃখ করিও না, আমি কাশী যাইতেছি। আমি আর অশান্তি সহ্য করিতে পারিতেছি না। বিশ্বনাথের কাছে আমি প্রার্থনা করিব যেন তোমাদের মধ্যে শান্তি আসে। আশীর্ব্বাদ জানিবে, বউকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। তাহার মুখ আমি ভুলিতে পারিতেছি না। তাহাকে কষ্ট দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা দিদি।"

সতীশই তাঁহাকে তাহার গাড়ীতে করিয়া সাত মাইল দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে পোঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

কার্ত্তিক আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। বেদনার—আত্মগ্লানির তাহার আর সীমা ছিল না। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু চারু কোন মতেই তাহার পা দুইটা ছাড়িল না—সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওগো দিদিকে ফিরিয়ে আন গো!

কার্ত্তিক পরম স্নেহভরে আজ তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল, আনব বৈ কি—দুজনেই যাব আমরা।

উভয়েরই মনের অবস্থা তখন অপূর্ব্ব—আনন্দ অথচ তাহার সহিত বেদনা—কিন্তু সে বেদনা তীব্র নয়। যেন কাঁটা ফুটিয়া সেটা বাহির হইয়া গেছে—স্বস্তির সঙ্গে সেখানে এখনও খানিকটা বেদনা খচ খচ করিতেছে।

আশ্চর্য্যের কথা—ছয়মাস হইয়া গেছে—তবু দিদিকে আজও ফিরাইয়া আনা হয় নাই।

কার্ত্তিক বলে, আহা! দুঃখের মানুষ, থাকুন দিনকতক সেখানে। ভগবানের আশ্রয়, এ কি মেলে সহজে!

চারুও সে কথাটা বোঝে, বলে, আহা! সে কি একবার!

দিদি চিঠি লিখিয়াছেন—বউ, খোকা হইবার পূর্ব্বেই যেন সংবাদ দিও। লজ্জা করিও না। আমি গিয়া সব ব্যবস্থা করিব।

বন্দিনী কমলা

রাজহাটের রায়বাড়ী প্রাচীন বনিয়াদী ঘর। কোম্পানীর আমল হইতে বহু বিস্তীর্ণ জমিদারী। সংসারটিও বিপুল।

ভাদ্র মাসের দিন, রায়বংশের সেজতরফের বড়মেয়ে বনলতা সিমেণ্ট-বাঁধানো মেঝের উপর সুবিপুল দেহখানি এলাইয়া দিয়া নিথর হইয়া পড়িয়া ছিল, স্পন্দনের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতেছে আর মধ্যে মধ্যে গালে-টেপা পান দুই-একবার মুখের মধ্যে নাড়িতেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারিটা বাজিয়া গেল। বনলতা একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিয়া শ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিল, ন'লে! ন'লে!

ন'লে—নলিনী সেজতরফের ঝি। নলিনীর সাড়া পাওয়া গেল না। নীচে রান্নাশালে ঠাকুর চাকরেরা গোলমাল করিতেছে। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। রায়বাড়ীর অনেক বিশেষত্বের মধ্যে এই একটি বিশেষত্ব! খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয় দেড়টায়—ছেলেরা খায় দেড়টায়, বাবুরা খান আড়াইটায়, মেয়েরা সাড়ে তিনটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উঠেন, তারপর চাকর-বাকরদের পালা পৌনে চারিটা, চারিটায়।

বনলতা আবার ডাকিল, ন'লে—ও ন'লে!

বড়তরফের ঝি কামিনী দরজার সম্মুখের বারান্দা দিয়া তেতালায় উঠিয়া গেল, সে সড়া দিল না। বনলতা উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ডাকিতেছিল, দেখিতে পাইল না, পায়ের শব্দ শুনিয়াও ফিরিয়া চাহিল না।

সে আবার ডাকিল, ন'লে! ন'লে! অ—ন'লে!

এবার একটি তরুণী বধূ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, কি বলছেন দিদি? বধূটি বড়তরফের কনিষ্ঠা বধূ, সদ্য বিবাহিতা।

বনলতা ফিরিয়া না চাহিয়াই বলিল, তোমাকে নয়, ন'লেকে ডাকছি।

বধূটি চলিয়া গেল, বনলতা আবার ডাকিল, অ—ন'লে!

বধূটি তেতালায় উঠিয়া গেল, একদিকের খোলা ছাদের উপর ভাদ্রের রৌদ্র মাথায় করিয়া বড়তরফের বড়মেয়ে পান ও দোক্তা হাতে চরকির মত অবিরাম ঘুরিতেছে। সে পাগল, অমনি করিয়া ঘোরাই তাহার ব্যাধি। মধ্যে

মধ্যে পান দোক্তা খায়, বিড় বিড় করিয়া বকে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে—আর অবিরাম ছাদের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। তরুণী বউটি এ বাড়ীতে সদ্য আগত, পাগলকে দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন হাঁপাইয়া ওঠে, কান্না পায়। ছাদটা অতিক্রম করিয়া তেতালার মহলে যাইতে হইবে, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পাগল এদিক হইতে ওদিকে পৌঁছিবামাত্র দ্রুতপদে ছাদটা অতিক্রম করিয়া গেল। নলিনী ঝি সেজগিন্নীর পা টিপিতেছিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছে। মৃদুস্বরে বধূটি ডাকিল, নলিনী!

নলিনী কথা বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কি?

বনলতাদি ডাকছেন তোমাকে।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে নীচেকার ঠোঁটটি উল্টাইয়া দিল, পরক্ষণেই বিরক্তিভরা মুখে অতি সন্তর্পণে সেজগিন্নীর পাখানি কোল হইতে পাশের পা-বালিশের উপর নামাইয়া রাখিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছিল, কিন্তু পাখানি নামাইয়া দিবামাত্র আরক্ত চোখ মেলিয়া তিনি তাকাইয়া দেখিলেন। নলিনী বলিল, বনোদি ডাকছেন, শুনে আসি। সেজগিন্নীর চোখ বন্ধ হইল। নলিনী নীচে চলিল—সঙ্গে সঙ্গে বধূটি। বধূটির বড় মুস্কিল হইয়াছে, সে যেন মাটির জীব, সমুদ্রতলের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ রাজ্যের নিয়মকানুন সব আলাদা! দিনে বেচারার ঘুম অভ্যাস নাই, কিন্তু বেলা তিনটার পর হইতে বাড়ীখানা পর্য্যন্ত যেন ঘুমে ঝিমাইতে থাকে। জাগিয়া থাকে এক পাগল—তাহাকে তাহার বড় ভয়। দোতালার সিঁড়িতে আসিয়াই শোনা গেল, অ—ন'লে! ন'লে! বনলতা সেই সকরুণ শ্রান্ত সুরে ডাকিতেছে।

নলিনী বলিল, মর তুমি! মর! ভোঁসকুমড়ি কোথাকার!

বধূটি অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বনলতার ঘরের সম্মুখে তাহারা পৌঁছিয়া গেল; বনলতা তখনও চোখ বন্ধ করিয়া ডাকিতেছে, ন'লে!

কি দিদিমণি? আমি সেজমার পা টিপছিলাম।

বনলতা কোন কৈফিয়ৎ দাবী করিল না, চোখ মেলিয়া অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া একটা হাত প্রসারিত করিয়া হাত দশেক দূরে মেঝের উপর নামানো একটা রূপার কৌটা দেখাইয়া বলিল, দোক্তার কৌটাটা দে—

নলিনী তাড়াতাড়ি কৌটাটা বনলতার কাছে আনিয়া নামাইয়া দিল।

বনলতা বলিল, আর একখানা পাতলা চাদর আমার গায়ে ঢেকে দে তো!

বধূটির বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না, সে বলিল, গরম লাগবে না দিদি? বড় মাছি লাগছে।

নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা চাদর আনিয়া বনলতার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। বধূটি বলিল, একটু বাতাস করব দিদি?

তুমি আর জ্বালিও না ছোটবউ! কেবল কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান! তুমি বাতাস করবে কেন? ঝি চাকর থাকতে বউয়ে বাতাস করে না কি?

ঘড়িতে ঢং করিয়া আধ ঘণ্টা বাজিল, বেলা সাড়ে চারিটা! বাড়ীটাতে যেন জনমানব নাই; কেবল কতকগুলো অস্বাভাবিক শব্দ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণে নাকডাকার শব্দ। নীচে কয়টা কাক উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া কল কল করিতেছে। ঝি চাকরেরা ঘুমাইতেছে।

বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া বউটি দাঁড়াইয়াছিল—সহসা তাহার হাসি পাইল; কাহার নাক ডাকিতেছে ঘোঁ-ঘোঁ-পট-পট-ফু—ৎ! পিছনে ঘরের মধ্যে বনলতাদিদিরও নাক ডাকিতে সুরু হইয়াছে। সহসা রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াই বধূটি চোখ বুজিয়া নাক-ডাকাইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নাকের ভিতর এবং তালুতে জ্বালা করিয়া উঠিতেই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া শূন্যমনেই জনশূন্য উঠানটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর মধ্যে মানুষের সাড়া জাগিয়া উঠিল—কেহ যেন সুরে করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছে। বাড়ীর গিন্নী অর্থাৎ বাবুদের মা এতক্ষণে দেবদর্শন করিয়া ফিরিলেন, টোলের পণ্ডিত তাঁহাকে গীতা শুনাইতেছে। গীতা শুনিয়া ঠাকুমা জল খাইবেন. তারপর তাঁহার রান্না চাড়বে, ঠাকুমা ততক্ষণ তাঁহার নিজের এস্টেটের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ শুনিবেন। খাইবেন বেলা ছয়টায়, তারপর আরম্ভ হইবে দিবানিদ্রা; দিবানিদ্রা সারিয়া উঠিবেন রাত্রি দশটায়। তারপর আরম্ভ হইবে মহাভারত পাঠ। রাত্রি বারোটায় সান্ধ্যকৃত্য শেষ করিলে পর তাঁহার রাত্রের খাবার তৈয়ারী হইবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ীর নাতি-নাতনী, ছেলে-বউ প্রত্যেকের সংবাদ লইবেন—আর বুড়ী ঝি দামিনী তাঁহার পায়ে তেল দিবে। শুইবেন রাত্রি দুইটার পর। বধূটি অকস্মাৎ খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, ঠাকুমার সে-কি নাকডাকা! বাপরে! সেদিন শেষরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিকট শব্দে ভয় পাইয়া স্বামীকে জাগাইয়া বলিয়াছিল. ওগো—ও কিসের শব্দ?

এক মুহূর্ত্ত শুনিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইয়া তাহার স্বামী বলিয়াছিল, ঠাকুমার নাক ডাকছে।

ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে! তাহার বিশ্বাস হয় নাই; সে আবার বলিতে গিয়াছিল, না, তুমি ভাল ক'রে শোন। কিন্তু তখন তাহার স্বামীরও আবার নাকডাকা সুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার ভাগ্য ভাল যে স্বামীর নাক ডাকে মৃদু শব্দে ফুরুর—ফুরুর!

সে সাহসী মেয়ে; ভয় বড় একটা সে পায় না; সে সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে যেন নাক-ডাকার কোরাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঘোঁ ঘোঁ। ঘড়র, ঘড়র, ঘোঁ। ঘড়র-পট-পট-ফুৎ। আরও কতরকম—মুখে শব্দ করিয়া তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। সমস্ত ধ্বনিকে ছাপাইয়া ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে—ব্যাণ্ড বাজনার জয়ঢাকের মত।

স্মরণ করিয়া বধূটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণ কণ্ঠের হাস্যধ্বনি কিছুক্ষণ বাড়ীটার খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনি হইয়া ফিরিল। সহসা গম্ভীর স্বরে কে প্রশ্ন করিল, কে?

বধূটি লজ্জায় মরিয়া গেল, মেজ খুড়শ্বশুরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বনলতার ঘরে ঢুকিয়া কপট নিদ্রায় কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মেজশ্বশুরের পায়ের সাড়া বারান্দাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পদশব্দ তেতালায় উঠিয়া গেল।

পাগলী আর্ত্ত চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।

মেজশ্বশুরের রুষ্ট কণ্ঠস্বর—তুই হাসছিলি? কাকে দেখে হাসছিলি? বল! বল!

প্রচণ্ড জোরে চড় মারার শব্দ! পাগলী বোবা জানোয়ারের মত চীৎকার করিতেছে। বধূটির একবার ইচ্ছা হইল, উঠিয়া গিয়া মেজশ্বশুরকে বলে, আমি হাসিয়াছি। ও নয়। কিন্তু তাও সে পারিল না।

বনলতা যতক্ষণ না উঠিল, ততক্ষণ সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ীটা আবার জাগিয়া উঠিল। সে জাগিয়া-ওঠা যেমন তেমন নয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে লঙ্কায় যেমন সোরগোল উঠিত, তেমনি

সোরগোল তুলিয়া জাগা। ছোট্ট ছেলেদের চীৎকার-হাসি-কান্না, বধূ ও কন্যাদের হাসি, ঝি সম্প্রদায়ের বাসনমাজা ও ঝাঁটার শব্দ, কথা কাটাকাটি, গিন্নীদের ঝি চাকরকে আহ্বান, বাড়ীটাতে যেন তুফান উঠিয়াছে।

বড়বাবুর দুধ নিয়ে আয়। মানদা! ঠাকুরকে বল ছেলেদের জলখাবার নিয়ে যাবে। বড়গিন্নী হাঁকিতেছিলেন। বধূটি এইবার উঠিল। বনলতা তখন উঠিয়া বসিয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, কি হে ছোটগিন্নী, তুমি যে দিনে ঘুমোও না। আমাকেও যে হার মানালে হে।

মৃদুস্বরে বধূটি বলিল, আমি ঘুমুই নি।

ওই হ'ল হে হ'ল। 'ছিল না কথা হ'ল গাল, আজ নয় হবে কাল।' দিনে শুলে তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে বল, আজ শুয়েছ, কাল ঘুমোবে। বনলতা গোটা দুয়েক পান ও খানিকটা দোক্তা মুখে পুরিয়া কথা বন্ধ করিল।

বউটি উঠিয়া শাশুড়ীর কাছে তেতালায় চলিল। একটা চাকর হন হন করিয়া বারান্দা দিয়া ওদিকের মহলে চলিয়াছিল, বনলতা তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া উঠিল, হ'রে! ও-হ'রে, শোন!

আমার এখন সময় নাই বাপু! তবু হরিচরণ দাঁড়াইল।

মেজজ্যাঠার সিদ্ধি নিয়ে যাচ্ছিস বুঝি?

হ্যাঁ। বাবু এখুনি চেঁচামেচি করবে; কি বলছেন বলুন।

আমাকে একটু সিদ্ধি দিয়ে যা। পেটটা বড় খারাপ হয়েছে। এই এতটুকু।

মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া হরিচরণ বলিল, কই গেলাস বার করুন।

বধূটি যাইতে যাইতেও কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। বনলতা বলিল, খাবে ভাই ছোটবউ? ভারী মজা হয়; যা হাসি পায়—সব ঘোরে, সব ঘোরে।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় বউটির সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল, যেন পলাইয়া গেল।

বনলতা বলিল, মেয়ে আনতে হয় সমান ঘর থেকে। এ বউটা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে কি না—

বাধা দিয়া হরিচরণ হাসিয়া বলিল, যেতে দেন দিনকতক দিদিমণি, তারপর—

সিদ্ধি ঢালিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। বনলতা

সিদ্ধিটুকু নিঃশেষে পান করিয়া আবার পান দোক্তা মুখে দিয়া উঠিল। নীচে হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে বাড়ীটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশটা রাজহাঁস বাড়ীর উঠানে আসিয়া কলরব করিতেছে। উহাদের খাবার দিতে হইবে। হাঁসগুলি বনলতার বাপের সম্পত্তি। বড়জ্যাঠার ছিল ঘোড়া, সে ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে। এখন আছে কেবল একটা ময়না, একটা চন্দনা, একটা কাকাতুয়া; গোটা কয়েক কাঠবেড়ালী, দুইটা খরগোস। মেজজ্যাঠার আছে শ দেড়েক পায়রা। বনলতার বাপের এই হাঁস। ছোটকাকার গোটা আষ্টেক কুকুর।

পায়রা ও কুকুরের প্রতি ভীষণ ঘৃণা বনলতার। পায়রাগুলো যা ঘর নোংরা করে, আর কুকুর তো অস্পৃশ্য—ছুঁইলে স্নান করিতে হয়! রাজহাঁসগুলি যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি ডিম খাইতে সুবিধা। বড়জ্যাঠার সখের জিনিসগুলিও ভাল। ময়নাটা যা চমৎকার ধমক দেয়, হারামজাদা, শালা, শুয়ার কি বাচ্চা! চমৎকার!

বউটির নাম মণি, মণিমালা। এ বাড়ীতে নাম হইয়াছে কাঞ্চনবউ। এ বাড়ীতে বধূদের নামকরণ হয় প্রাচীন প্রথায়; মাণিকবউ, রাণীবউ, মতিবউ, রত্নবউ, সুবর্ণবউ, আতরবউ, বেলাবউ, অর্থাৎ হীরা মণি মাণিক্য মুক্তা পান্না প্রভৃতি মহার্ঘ্য এবং আতর বেলা চাঁপা প্রভৃতি পরম আদরণীয় বস্তুর নামে নামকরণ করা হয়।

কাঞ্চনবউ তেতালায় উঠিতে উঠিতেই শুনিল, তাহার শাশুড়ী ঝিকে বলিতেছেন, দেখ্ তো রে, কাঞ্চন বউমা কোথায় গেল।

কাঞ্চনবউ গতি দ্রুততর করিল। শাশুড়ী আপন মনেই বোধ করি বলিতেছিলেন, সমস্ত দুপুর মেয়ে কেবল ঘুরে বেড়াবে, সকালে ঘুমোবে আর কাগচিলের মত বউমা এখান-ওখান ক'রে ফিরবে। বলে, অভ্যেস নেই। অভ্যেস থাকবে কোথা থেকে? গেরস্ত বাড়ীর মেয়েদের কি ঘুমোবার সময় থাকে!

কাঞ্চনবউ নতমুখে শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী বলিলেন, এই যে, কোথায় ছিলে সমস্ত দুপুর।

কাঞ্চনবউ চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, যাও চুল বেঁধে কাপড়-চোপড় কেচে নাও। ঠাকরুণ ডেকেছে তোমাকে, আজ থেকে তোমাকেই

লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেখাতে হবে। বাড়ীর ছোটবউয়েই ও-কাজ চিরকাল করে।

তাড়াতাড়ি চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া লালপাড় গরদের একখানি শাড়ী পরিয়া কাঞ্চনবউ প্রস্তুত হইয়া শাশুড়ীর অপেক্ষা করিয়া রহিল, তিনিই তাহাকে বাড়ীর গিন্নীর কাছে লইয়া যাইবেন।

নীচে খুব সোরগোল উঠিতেছে। রান্নাশালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যস্ততা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বনলতা হাঁকিতেছে, সেই সুরে, সেই ভঙ্গিতে, ন'লে—অ ন'লে!

ন'লে এবার অল্পেই সাড়া দিল, যাই।

বনলতা বলিল, আসতে হবে না। আজ এত রান্নার তাড়া কেন রে?

ছোটকর্ত্তা শীকারে যাবেন তাই।

কি শীকার রে? কোথায়?

বনশুয়োর এসেছে নদীর ধারে। রেতে আউশ ধান খেতে আসে—

বনলতা বাকীটা আর শুনিল না, বলিল, মরণ! পাখীটাখী হলেও মানুষে খায়। শুয়োর মেরে কি হয়? অনর্থক জীবহত্যা।

রান্নাশালের পাশে বিস্তৃত সরঞ্জাম পড়িয়াছে চায়ের। মেজবাবুর কাছে সরকারী সাহেব আসিয়াছে; মেজবাবু এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার এবং আরও অনেক কিছু। তাহা ছাড়া বড়বাবুর বড়ছেলে, কাঞ্চনবউয়ের বড়ভাসুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারশ্যাল বসিয়াছে।

কাঞ্চনবউ অবাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড বড় বাড়ীর প্রতিটি কোণে যেন তাহার জন্য বিস্ময় লুকাইয়া আছে রূপকথার মায়াপুরীর মত। এ বাড়ীর লক্ষ্মীর-ঘর সকলের চেয়ে বড় বিস্ময়। লক্ষ্মীর-ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে নাকি বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছে; সে ঘরের দরজা কখনও খোলা হয় না; বন্ধ দুয়ারের সম্মুখে ধূপ প্রদীপ রাখিয়া অর্চ্চনা করা হয়। কাঞ্চন-বউয়ের কৌতূহলের সীমা ছিল না। মণি বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই অভাবনীয় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে স্বচ্ছন্দ সাহসের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী; বড়দাদা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী, ছোটদাদা গান্ধীসেবক, কাঞ্চনবউ সকলের ছোট; শৈশবে

মাতৃহীন হইয়া মেয়েটি এই উদাসীর সংসারে আরণ্য-লতার মত জীবনের সকল প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন শক্তিতে বড় হইয়াছে। তাহার রূপ দেখিয়া তাহাকে এ বাড়ীতে আনা হইয়াছে। কিন্তু এ বাড়ীর মৃত্তিকার সকল রস, এ বাড়ীর আকাশের সকল আলো-বাতাস তাহার জীবনের ধাতু-প্রকৃতির পক্ষে বিষ না হইলেও বিষম হইয়া উঠিয়াছে। তবু তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই, তাহার জীবনী-শক্তি কিছুতেই পরাজয় মানিতে চায় না। বড়গিন্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উলঙ্গ একটি বারো বৎসরের বালক। তাঁহার বড়ছেলের বড়ছেলে।

বড়গিন্নী এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন বড়ছেলের বড়ছেলেটিকে লইয়া। বারো বছরের ছেলেটিকে লইয়া বড়গিন্নীর ঝঞ্ঝাটের আর সীমা নাই। তাহার সমস্ত কিছু বড়গিন্নীকে করিতে হয়। অপটু মায়ের আট মাসের সন্তান ছেলেটি। আঁতুড়ে তাহাকে আঙুরের মত তুলায় মুড়িয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর বহু সযত্ন পরিচর্য্যায় বড়গিন্নী তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। এখন সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু তবু তো সে আটমাসে ভূমিষ্ঠ অপরিপুষ্ট ছেলে, সেই জন্যই সকালে বড়গিন্নী বুরুষ দিয়া তাহার দাঁত মাজিয়া দেন, জিভ ছুলিয়া দেন, মুখে কুলকুচার জল তুলিয়া দেন—খাওয়াইয়া তো দেনই, বেচারা এখনও নিজে হাতে তেল পর্য্যন্ত মাখিতে পারে না; সেও তাঁহাকে মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়। তাহারই পরিচর্য্যায় তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন; সন্ধ্যায় একটা কবিরাজী তেল মাখাইবার ব্যবস্থা আছে, সেই তেল মাখাইয়া গা মুছিয়া উলঙ্গ ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিলেন, এস বউমা, শ্বশুরকে প্রণাম করে নাও, তারপর চল।

বড়কর্ত্তা সান্ধ্যকৃত্য করিতেছিলেন, কুলধর্ম্মে রায়েরা তান্ত্রিক, কিন্তু বড়বাবু শিব-ভক্ত। ঘরের বাহির হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—শিব-শম্ভু, শিব-শম্ভু! শঙ্কর, শঙ্কর!

বেচারা বধূটির সর্ব্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর কি যে খান—মদটা সে বুঝিতে পারে, কিন্তু ছোট কল্কেতে সাজিয়া চাকরটা কি যে তাঁহাকে দেয়! দুর্গন্ধে বাড়ীটা শুদ্ধ ভরিয়া উঠে! কিন্তু উপায় ছিল না।

বড়কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, কি গো আমার মা লক্ষ্মী?

কাঞ্চনবউ প্রণাম করিল।

একেবারে নীচের তলায় বাড়ীর ঠিক মাঝখানে প্রশস্ত একখানি ঘর, কিন্তু অন্ধকূপের মত অন্ধকার, একটি দরজা ভিন্ন আর দরজা নাই অথবা জানালা নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই মণি একটা গুমোট গরম অনুভব করিল, নাকে ঢুকিল ভ্যাপ্সা একটা গন্ধ। হাতের প্রদীপের আলোয় ঘরের গাঢ় অন্ধকার আবছায়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। মণির সর্ব্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তাহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না; সে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল! অন্ধকার, ঘরের কোণে কোণে যেন অশরীরীর মত ছাদে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কতকগুলি লোহার সিন্দুক!

এই ঘরে এই দোরের কাছ থেকে।

মণি চমকিয়া উঠিল। লাঠির উপর ভর দিয়া বার্দ্ধক্যে অবনমিতদেহ বৃদ্ধা কর্ত্রী দন্তহীন মুখে জড়িত স্বরে বলিলেন, এই ঘরের এই দোরের কাছে পিদীম ধূপদানী রাখ লো ভাই নাতবউ। এই হ'ল আমাদের লক্ষ্মীর ঘর।

মণি দেখিল বিবর্ণ কালো একটি চতুষ্কোণ স্থান; ক্রমে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হইল--ওটা একটা দরজা, দরজাটার শিকলের মুখে মরিচাধরা একটা তালা ঝুলিতেছে।

কর্ত্রী বলিলেন, আমার দিদিশাশুড়ী, বুঝলি ভাই, এই ঘরে মা লক্ষ্মীকে বন্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। এই দরজা যতদিন না খুলবে, ততদিন মা লক্ষ্মী এ বাড়ীতে বাঁধা থাকবে। আমার বড়শ্বশুর ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান—তখন নবাবের আমল—

তিনিই এ দেশের প্রথম জমিদার। কোম্পানীর দেওয়ানী করিয়াই তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। মণিমালা তাঁহার নাম শুনিয়াছে, তাঁহার নাম ছিল—গোপীবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায়; তিনি প্রথম সরকার হইতে রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি নাকি একেবারে অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন।

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, বুঝলি ভাই, ভাঙা ঘর, রাত্রে শেয়ালে এসে আগড় ঠেলে রান্না খেয়ে যেত। বাড়ীর চারিদিকে ছিল কুকুরসোঙার বন, ঝর ঝর ক'রে জল পড়ত, রাত্রে ঘুমুতে না পেয়ে আমার বড়শ্বশুর কাঁদতেন, বড়শ্বশুরের মা বল্‌তেন, 'এই কুকুরসোঙার বন, এই ভাঙা কুঁড়ে ভেঙে অমুক রচবে বৃন্দাবন।' তাই তিনি করেছিলেন। কোম্পানীর কুঠিতে প্রথমে তিনি সর্দ্দার হয়ে ঢুকেছিলেন।

গোপীবল্লভ প্রথমে পাইকদের সর্দ্দার হইয়া কোম্পানীর চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে মুন্সী তারপর গোমস্তা, তারপর নায়েব, তারপর হইয়াছিলেন দেওয়ান।

তখন কোম্পানীর কাছে তাঁতীরা সব দাদন নিত; কিন্তু দাদন শোধ করবার সময় সব লুকিয়ে বসে থাকত। সে দাদন আর আদায় হ'ত না। তখন সায়েব বললে, যে এই দাদন আদায় করতে পারবে তাকেই আমি দেওয়ান করব। এই আমার বড়শ্বশুরের কপাল খুলে গেল। খুঁজে খুঁজে তাঁতীদের সব ধ'রে এনে খুঁটিতে বেঁধে, দাদন একেবারে পাই-পয়সা আদায় ক'রে দিলেন! বুঝলি ভাই নাতবউ। সাধারণ পুরুষ ছিলেন কি তিনি? তাঁর ডাকে বাঘে বলদে একঘাটে জল খেত।

সত্য কথা। সে আমলে গোপীবল্লভকে লোকে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বলিয়া মানিত। কোম্পানীর কর্ত্তা সাহেবদের তিনি ছিলেন ডান হাত। মণিমালা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দিদিশাশুড়ীর কুঞ্চিতচর্ম্ম দন্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। সে-আমলের কথা সেও অনেক জানে। তাহার বিবেকানন্দ-ভক্ত বাপ, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী বড়দাদা, গান্ধীপন্থী ছোটদাদার কাছে অনেক শুনিয়াছে।

দিদিশাশুড়ী অকস্মাৎ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, ইদিকে জাঁদরেল হ'লে হবে কি ভাই, বুড়ো খুব রসিক ছিল, বুঝলি, ষাট বছর বয়েসে বুড়ো তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিল। প্রথম দু'পক্ষের ছেলেপুলে ছিল না, তারপর ষাট বছর বয়েসে নৌকো ক'রে যেতে গাঙের ঘাটে আমার দিদিশাশুড়ীকে দেখে বুড়োর মুণ্ডু ঘুরে গেল। বুঝলি ভাই, সে-আমলে পুজোর সময় লোকে দুর্গা ঠাকরুণের পিতিমে না দেখে নাকি দেখত আমার দিদি-শাশুড়ীকে। এই টানা টানা চোখ, দুধে-আলতায় রঙ, চাঁপার কলি আঙুল; সবচেয়ে বাহারের ছিল তাঁর চুল। ভোমরার মত কাল, আর কোঁকড়ানো।

তাঁরই পেটে জন্মালেন আমার শ্বশুর। আর কি ভাগ্যি ছিল আমার দিদি-শাশুড়ীর; বিয়ের পরই দুই সতীন টুক টুক ক'রে মরে গেল। তখন এই বাড়ী হ'ল। বুড়ো না কি বলত, এ মাণিক আমি রাখব কোথা। নাম দিয়েছিলেন মাণিকবউ। [illegible] আতরের ভরি ছিল আশী টাকা। ঢাকা থেকে ঢাকাই কাপড় আসত। কাশী থেকে আসত গরদ। বলিয়া ঠোঁটের ডগায় একটা পিচ কাটিয়া বলিলেন, বুঝলি ভাই নাতবউ—বর—তোমার গিয়ে বুড়োই ভাল। নইলে ভাই আদর হয় না। জানিস তো 'প্রথমপক্ষ হ'ল হেলা-ফেলা, দ্বিতীয়পক্ষ ফুলের মালা, আর তৃতীয়পক্ষ হ'ল হরিনামের ঝোলা'—ও তোর গলাতেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

কাঞ্চনবউ মুখ নত করিয়া মৃদু হাসিল। দিদিশাশুড়ী বলিলেন, হাসছিস বুঝি? তোর ওই ছোঁড়া বর তোর আদর করবে মনে করছিস? এ বাড়ীর সবারই বার-ফটকা রোগ আছে। ছোঁড়াকে খুব ক'ষে লাগাম টেনে রাখবি, বুঝেছিস!

মণি বলিল, আপনি মা লক্ষ্মীর কথা বলুন!

তাই বলছি লো। সে আমার দিদিশাশুড়ীর আমলে। তখন বুড়ো মারা গিয়েছে সদ্য। আমার শ্বশুরের বয়েস তখন বছর বিশেক; সবে বিয়ে হয়েছে। তখন আমাদের নায়েব ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার বড়শ্বশুরের হাতে তৈরী নায়েব। শ্বশুর বলতেন, কিত্তিকাকা, দাপট কি তার। সমস্ত ছিল তার হাতে; ভারী কুটিল লোক ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার শ্বশুর তাকে খুন ক'রে তবে সম্পত্তি হাতে পান। সপ্তমী পুজোর দিন তাকে খুন করেছিলেন।

মণি শিহরিয়া উঠিল—খুন!

হ্যাঁ। তা নইলে সে কি আর সম্পত্তি দিত শ্বশুরকে! আমার দিদি-শাশুড়ী কিন্তু শ্বশুরকে বললেন, এ কি মহাপাপ করলি তুই! আমার বংশ কি ক'রে থাকবে? সেই তিনি একবারে যোগিনী সাজলেন, গেরুয়া কাপড় পরলেন, গায়ে নামাবলী নিলেন, তেল ছাড়লেন, কোঁকড়ান চুল রুখু হয়ে ফুলে চামরের মত হয়ে উঠল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, চুল তাঁকে কাটতে দেয় নি ঘরের লোকে। আটদিন উপোস ক'রে থাকলেন—"মা, এ মহাপাপ থেকে আমার বংশকে রক্ষে কর।" তারপর আঙুল গুণতে আরম্ভ করলেন, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, তেরোদশী, চতুরদশী পূর্ণিমে—আটদিন, সেই দিন কোজাগরী পূর্ণিমে।

সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে অষ্টাহ উপবাসিনী গোপীবল্লভের পরমা-সুন্দরী সহধর্ম্মিণী ওই লক্ষ্মীর ঘরে ঘৃতদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন, এই প্রাসাদতুল্য বাড়ীটির ফটক হইতে অন্দর পর্য্যন্ত সারি সারি আলো জ্বলিতেছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় যেন ভুবন ভাসিয়া যাইতেছিল। কেবল দিগন্তের এক কোণে কোন্ সুদূর দুরান্তে সচকিত বিদ্যুৎ-চমকের ক্ষীণ আভাস মধ্যে মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল। সমস্ত বাড়ী নিঝুম, দাসদাসী পুত্র পুত্রবধূ সব ঘুমঘোরে অচেতন। কোজাগরী পূর্ণিমায় এমনি চৈতন্যহারা ঘুমই মানুষের চোখে নামিয়া আসে। আজও আসে। লক্ষ্মীদেবী এই জ্যোৎস্নাময়ী কোজাগরী নিশীথে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হন। প্রশ্ন করেন সুধাক্ষরা কণ্ঠে, কোজাগরী রাত্রে—কে জাগে রে? কে জাগে?

উত্তর দেয় ভক্তিমান গৃহস্থের গৃহদ্বারের আলোকশিখা ও আলিপনা, সেই আলোকিত আলিপনারেখা ধরিয়া তিনি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন কেহ জাগিয়া আছে কি না! জাগিয়া থাকিলে পূজাগ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ দিয়া আবার বাহির হন। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মা লক্ষ্মী রায়বাড়ীতে দেখা দিলেন না; গোপীবল্লভের রূপসী বিধবার চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। তারপর রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহরের প্রথম ভাগ, অকস্মাৎ জ্যোৎস্না কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। সে বাতাসে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। গোপীবল্লভের বিধবার ভক্তি ও নিষ্ঠার সীমা ছিল না, তিনি আবার প্রদীপ জ্বালাইয়া সেজ দিয়া সেগুলি ঢাকিয়া দিলেন। কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, চারিদিক অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ।

সেই দুর্য্যোগের মধ্যে প[illegible]। একটি মেয়ে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কে জেগে রয়েছ গো? আমাকে একটুখানি বসতে দেবে? অন্ধকারে আমি পথ পাচ্ছি না।

অপূর্ব্ব পদ্মগন্ধে রায়গিন্নীর মনপ্রাণ তখন উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে হাসিলেন, মুখে বলিলেন, দিতে পারি মা, এক সর্ত্তে।

কি বল!

তুমি এইখানে বস। আমি একটু বাইরে যাব, যতক্ষণ না ফিরব আমি ততক্ষণ কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে।

বেশ।

মেয়েটিকে ঘরে বসাইয়া গোপীবল্লভের বিধবা উঠিলেন, ঘরের দরজাটা টানিয়া শিকল দিতে দিতে বলিলেন, আমি শেকল দিয়ে যাচ্ছি, এসে খুলে দেব। তারপর দিলেন ওই তালা।

ছেলেকে ডাকিয়া তুলিয়া সমস্ত বলিয়া ছেলের হাতে চাবি দিলেন, তারপর বলিলেন, ও তালা তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা লক্ষ্মীকে আমি বন্দিনী ক'রে চললাম।

কোথায় মা?

মা হাসিয়া বলিলেন, কর্ত্তাকে খবর দিতে বাবা। বলিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, ছেলে গেল পিছন পিছন। মা গঙ্গার কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। শরতের মেঘ কাটিয়া তখন আবার চাঁদ উঠিয়াছে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার বুকে লাখে লাখে চাঁদমালা ভাসিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। গোপীবল্লভের বিধবা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

গল্প শেষ করিয়া বর্ত্তমান রায়গিন্নী বলিলেন, সে চাবীও আমার শ্বশুর গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছেন।

মণিমালা বিচিত্র দৃষ্টিতে ওই তালাটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, অন্ধকূপের মধ্যে মা লক্ষ্মীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে! চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল।

বিগত শতাব্দীর স্বপ্ন-কল্পনার কাহিনী, তরুণী কিশোরীটির সমস্ত চেতনাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিল। সাধারণ তরুণীর কল্পনায় হয় তো ভাসিয়া উঠিত মণিরত্নময় এক ধন-ভাণ্ডার, যে মরকত তাহারা চোখে কখনও দেখে নাই—কল্পনায় সেই মরকত দিয়া এক পদ্ম গড়িয়া তাহার উপর কল্পনা করিত পটের অথবা মাটির লক্ষ্মীদেবীকে; কোণে ঝাঁপি, পায়ের কাছে পেঁচা। কিন্তু মণিমালা এ বাড়ীর কাঞ্চনবউ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া মেয়ে। তাহার কল্পনায় কেবলই ভাসিয়া উঠিল, বন্ধদ্বার অন্ধকার ঘরের মধ্যে রক্তমাংসের সুকুমারী একটি মেয়ে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে। চোখ হইতে টপ টপ করিয়া মুক্তার মত নিটোল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া

পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, গভীর রাত্রে হয় তো গুন্‌গুন্ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। মেয়েটির গোলাপ ফুলের দেহবর্ণ বাসী চাঁপার মত হইয়া গিয়াছে!

কাঞ্চনবউ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। পায়ের তলায় সিমেণ্টের কঠিন শীতল স্পর্শ তাহার অনুভূতির অগোচর থাকিয়া গেল! সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাশালে রান্নার গন্ধ উঠিতেছে, সে গন্ধও তাহার গোচরে আসিল না। তাহার ছোট খুড়শাশুড়ীর ঘরে গ্রামোফোনে একটি নাচের গান বাজিতেছে। ঝি'দের কোলে কয়টি শিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, মায়ের কোলের জন্য। বনলতার ঘরে তাসের আসর বসিয়াছে। বনলতা কেবলই হাসিতেছে সিদ্ধির ঘোরে। সেজকর্ত্তা ছাদে পায়চারী করিতেছিলেন। বধূটিকে দেখিয়া দ্রুতপদে তিনি ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। ওই তাঁহার এক বিশেষত্ব, কাহারও সহিত কথা বলেন না, লোক দেখিলেই ঘরে ঢুকিয়া যান। ভোরবেলা হইতেই বাহির হইয়া গো-শালায়, গরু ছাগল ভেড়া ও হাঁসের পাল লইয়া থাকেন; দ্বিপ্রহরে একবার খাইয়া যান, আবার সন্ধ্যায় ফেরেন, তারপর অন্ধকারে ছাদে পায়চারী করেন; লোক দেখিলেই ঘরে ঢোকেন, লোক চলিয়া গেলেই বাহির হইয়া আসেন। বড়কর্ত্তার ঘরে মেজকর্ত্তা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠিতেছে চট-পট-চট-পট, চাকরে বড়কর্ত্তার গা-হাত-পা টিপিতেছে।

মেজকর্ত্তা বলিতেছেন, বেটা শুয়ার কি বাচ্চার আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি? হাজার পাঁচেক টাকার দরকার, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শালা বলে কিনা, আগের দেনাটা প্রায় লাখ পাঁচেকে গিয়ে দাঁড়াল।—জানে না বেটা উল্লুক, রায়বাড়ীতে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মৃদুস্বরে বড়বাবু বলিলেন, চাপরাশী দিয়ে বেটার কান মলিয়ে দিলে না কেন?

দেওয়া উচিত ছিল তাই। কিন্তু কালই আমার টাকার দরকার, সার্কেল অফিসার এসে বসে আছেন, চাঁদার জন্যে। বলেছি কালই দোব টাকা।

রুদ্ধদ্বার ঘরের বাহিরে যেমন বায়ু প্রবাহ বহিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সমস্ত বহিয়া গেল মণিমালার মনের বহির্লোকে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আপনার ঘরে বসিল।

বনলতার ছোটবোন বছর দশেকের মেয়েটি—নাম স্নেহলতা, সে আসিয়া

কাঞ্চনবউয়ের পাশে বসিল। কাঞ্চনবউ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

মেয়েটি বলিল, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

কাঞ্চনবউ সস্নেহে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

সে বলিল, আমাকে একটা পয়সা দেবেন?

পয়সা? পয়সা নিয়ে কি করবে?

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

কাঞ্চনবউ বাক্স খুলিয়া একটি আনি তাহার হাতে দিল; মেয়েটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চুপি চুপি এবার বলিল, জানেন, আমার বাবার পয়সা-কড়ি কিছু নেই। ওই যে মেজজ্যাঠা. গাঁদা-মিনসে, সব ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে। কাউকে কিচ্ছু দেয় না।

মণিমালা অবাক হইয়া গেল। 'এমন কথা, এসব কথা বলিতে নাই' বলিতেও সে ভুলিয়া গেল।

মেয়েটি আবার বলিল, বাবা আমার মুখ্যু. গাঁজা খায়, গুলি খায়, তাই জন্যে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। লোক দেখলে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে; মেজজ্যাঠা মদ খায় কিনা, তাই ওকে খুব ভয় করে বাবা। বাবা যে গুলিখোর! বলিয়াই সে হাসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, জানেন, মাছি ধ'রে বাবা কানের মধ্যে পোরে। বন্ বন্ শব্দ করে, তাই—

বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিতেই মেয়েটি শশব্যস্ত হইয়া কথা শেষ না করিয়াই নিমিষের মধ্যে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই বড়গিন্নীর ঝি কামিনী উঁকি মারিয়া বলিল. ন্যে'হ এসেছিল বুঝি বউদিদি?

কাঞ্চনবউয়ের কথা সরিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

ঝি বলিল, দেখ দেখি সব ভাল ক'রে, কিছু চুরি ক'রে নিয়ে গেল কিনা! মেয়েটা চোর, খবরদার ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়ো না।

কাঞ্চনবউয়ের এবার মনে হইল সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। ঝিটা চলিয়া যাইতেই সে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

বাহির দিকের জানালা দিয়া রিহারশ্যালের বক্তৃতার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

ক্রমশঃ বাড়ীর শব্দ-কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। উপরে ঘরে ঘরে মৃদু নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে কেবল

ঠাকুর চাকর ও ঝিদের কথাকলহ। কাঞ্চনবউয়ের স্বামী বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। কাঞ্চনবউ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, রাত্রে সে ঘুমাইবে না, জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, মৃদু কান্নার শব্দ অথবা কঙ্কন-ঝঙ্কার শোনা যায় কি না সে শুনিবে।

তাহার স্বামী বলিল, ক'লকাতায় যাচ্ছি, কিছু বরাত থাকে তো বল।

চকিত হইয়া মণি বলিল, ক'লকাতা?

হ্যাঁ। ষোড়শী প্লে দেখতে যাচ্ছি। আমাদের ষোড়শী হচ্ছে কিনা এবার।

মণি চুপ করিয়া রহিল।

হাসিতে হাসিতে স্বামী কহিল, আর একটা মতলব আছে। আগে কাউকে বলছি না সেটা। একেবারে সব তাক লাগিয়ে দেব।

মণি এবারও কিছু বলিল না, শুধু হাসিল, মৃদু ম্লান হাসি।

বারবার ঘাড় নাড়িয়া স্বামী বলিল, হুঁ, হুঁ, অবাক হয়ে যাবে সব। কাউকে ব'ল না যেন, মোটর কিনব একখানা. দাদা সব মতলব ঠিক ক'রে ফেলেছে। ডি-লাক্স সেলুন বডি—ফোর্ড!

সহসা মণি চমকিয়া উঠিল। চাপা কান্নার শব্দ! কে কাঁদে? সে তাড়াতাড়ি স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে কাঁদছে?

কাণ পাতিয়া শুনিয়া স্বামী বলিল, বারবার বললাম দাদাকে, এত ক'রে টেন না! নেশার ঘোরে বউদিকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে! নাও, শোবে এস।

স্বামী বিছানায় ধপাস করিয়া বসিয়া শরীর এলাইয়া দিল। আবার সে ডাকিল, শোও এসে।

কাঞ্চনবউ উত্তর দিল না! কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই স্বামীর নাক ডাকিতে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ পরে নীচের রান্নাশালের সাড়াশব্দ স্তব্ধ হইয়া গেল। ওদিকে দিদিশাশুড়ীর মহলে কেবল মৃদু সাড়া উঠিতেছে। লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে। ঠাকুমায়ের জলখাবার তৈয়ারী হইতেছে।

পাশের আমবাগানে পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়া গেল বোধ হয়। টক্ টক্ শব্দে ওটা বোধ হয় তক্ষক ডাকিতেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় একটা ব্যাঙ কাতরাইতেছে, অজগরে উহাকে গ্রাস করিতেছে। আরও একটু নিবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনবউ শুনিল, আমবাগানে অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে। কই পদ্মগন্ধ তো পাওয়া যাইতেছে না! মৃদু কঙ্কন-ঝঙ্কারও

তো উঠিতেছে না, সন্তর্পিত কোমল চরণপাতে ক্ষীণ নূপুর-ধ্বনি কিংবা কান্না কি দীর্ঘনিশ্বাস, কিছুই তো শোনা যায় না! সন্তর্পণে সে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীখানা সুষুপ্ত; দিদিশাশুড়ীর মহলেও আর সাড়া-শব্দ উঠিতেছে না। কেবল সমবেত নাসিকা গর্জ্জনের ধ্বনিতে বাড়ীখানা মুখরিত ঠাকুমায়ের নাক ডাকিতেছে—সেই অদ্ভুত বিকট শব্দে।

আজ কিন্তু কাঞ্চনের হাসি আসিল না।

ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। আবার পেঁচারা ডাকিয়া উঠিল, দূরে মাঠে ডাকিয়া উঠিল শেয়াল। কোথাও কেহ কাঁদে না; কাহারও দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম আভাষও পাওয়া যায় না!

পূর্ব্ব আকাশে শুকতারা উঠিয়াছে; রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনবউয়ের যেন মোহ কাটিল। সে অনুভব করিল, দেহ তাহার ভার হইয়া পড়িয়াছে, চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত বাড়ীখানা এখনও সুষুপ্ত। সে ঘরের ভিতর গিয়া বিছানায় শুইল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে অসাড় হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে মোহ জাগিয়া উঠে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে। প্রদীপ ও ধূপদানী নামাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া সে একাগ্র উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করে। ঘরের মধ্যে মাথার উপর চামচিকা উড়িয়া বেড়ায়, বন্ধঘরের গুমটে দর দর করিয়া ঘাম পড়ে। কিছুক্ষণ পর নিজেই সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসে।

এক-একদিন সে তালাটার দিকে চাহিয়া দেখে। মরিচা-ধরা তামাটে রঙের তালাটা জাম ধরিয়া একটা অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সাহস করিয়া সে একদিন তালাটা নাড়িয়া দেখিল। সচেতন বুদ্ধি সত্ত্বেও তালাটার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিয়াছে। দ্রুতপদে সে উপরে উঠিয়া গেল।

রান্নাশালে আজ ছোটশ্বশুরের হাঁকডাক শোনা যাইতেছে। তিনি আজ

রাশীকৃত পাখী শীকার করিয়াছেন, সেই পাখী রান্নার জন্য তিনি মসলা বাটাইতেছেন। রান্না হইবে বাহিরে কাছারী বাড়ীতে, বাড়ীর মধ্যে বৃথা মাংস প্রবেশ করিতে পায় না।

বনলতার ঘরে তাসের আড্ডা বসিয়াছে; আজ কিন্তু আড্ডাটি নিঃশব্দ, নিঃশব্দে সকলে খেলিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দোতালাটাই আজ কেমন শব্দহীন গতিতে চলিয়াছে। নিঃশব্দ সেজকর্ত্তা দ্রুতপদে ছাদ হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বড়কর্ত্তার ঘরে মেজকর্ত্তার কি আলোচনা হইতেছে। বৃদ্ধা রায়কর্ত্রী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।

মহাজন নালিশ করিয়াছে, দাবী হইয়াছে প্রায় ছয় লক্ষ। সেই লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

মেজকর্ত্তা সাহেব-সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তিনি বলিতেছেন, লক্ষ্মীর ঘর খুলিয়া দেখা যাক। এ যুগে 'লক্ষ্মী বন্দিনী' এ প্রবাদ রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার বিশ্বাস পূর্ব্বপুরুষ গোপীবল্লভের পত্নী ওই ঘরে মহামূল্য গুপ্তধন লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, না। ইস্পাতের মত কঠিন অনমনীয় তাঁহার কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধা কর্ত্রী বলিলেন, আমি আত্মহত্যে করব তা হ'লে—এই তোকে ব'লে রাখলাম কিন্তু।

পরদিন সন্ধ্যা দিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল। নতজানু হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া করজোড়ে সে প্রার্থনা করিল, মা, মা লক্ষ্মী! দয়া কর মা! তুমি রায় বংশকে রক্ষা কর। যে বাড়ীতে তুমি অচলা হয়ে রয়েছ, সেখানে ঋণের কষ্ট কেন?

আবার তাহার চোখে জল আসিল। উঠিয়া প্রদীপটি তুলিয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কালো দরজাটা পাথরের মত অনড়, অচল! সহসা দরজার তালাটার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল; ব্যগ্র ঔৎসুক্যে সে তালাটার অতি নিকটে আলোটা তুলিয়া ধরিল। শতাব্দীর রসনা অবহেলিত তালাটা প্রথম দৃষ্টিতে অখণ্ড পাথরের মত মনে হইলেও, ক্ষয়িত হইয়া কখন খুলিয়া গিয়াছে কেবল ঝুলিয়া আছে।

অত্যুগ্র উত্তেজনায় তালাটা ধরিয়া সে টানিল।

তারপর সেই পাথরের মত অনড় অচল দরজার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার দিয়া ঠেলা দিল।

বারবার! বারবার! সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গের ঝিটা সভয়ে ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিয়াছিল।

সমস্ত রায় বাড়ী ভাঙিয়া আসিল।

সর্ব্বাগ্রে মেজকর্ত্তা!

দুয়ার খুলিয়া গেল।

শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকালের বন্ধ বায়ু—তাহার স্পর্শ গন্ধ তীব্র উগ্র, অসহনীয়! মেজকর্ত্তা দুয়ারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখিলেন।

ছোট একখানি ঘর চোর-কুঠরীর মত।

শূন্য—কোথাও কিছু নাই. কিন্তু মেঝের উপর ওটা কি পড়িয়া?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাঞ্চনবউ দেখিল—একটা নরকঙ্কাল, আর ওটা? ধূসর বিবর্ণ, ওটা কি?

ধীরে ধীরে ঘরখানার তীব্র অসহনীয় গন্ধ স্পর্শ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

মেজকর্ত্তা একবার অগ্রসর হইয়া ধূসর বস্তুটিকে হাতে করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন, কাঞ্চনবউ দেখিল, সকলেই দেখিল একরাশি চুল; বিবর্ণ হইয়া গেছে, কিন্তু তবু অনুমান করা যায়—সে চুল এককালে ভ্রমরের ন্যায় কালো এবং কুঞ্চিত ছিল। মেঝের উপর আরও পড়িয়াছিল—একখানা বিবর্ণ জীর্ণ কাপড়, কি চাদর, পাড়ের চিহ্ন দেখা যায় না—আর একখানা নামাবলী।

অকস্মাৎ কাঞ্চনবউয়ের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস

প্রথম আষাঢ়েরই কয়েকদিনের জন্য একবার মেঘ দেখা দিয়া সেই যে মুখ লুকাইল, আর গোটা আষাঢ় এমন কি শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল তবু দেখা দিল না। মেঘের প্রত্যাশায় চাহিয়া চাহিয়া চাষী ও মজুরদের ক্লান্ত চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু আকাশ হইতে এক ফোঁটা জল ঝরিল না।

দেবতার চরণে অনুক্ষণ অনুনয়, বিনয়, কাতর প্রার্থনার বিরাম ছিল না। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না দেখিয়া এবার তাহারা পূজার ব্যবস্থা করিল। বিনয়ের পরিবর্ত্তে বিনিময়ের ব্যবস্থায় তাহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সভ্যতার সম্পদে এ অঞ্চলটীর কেন্দ্রস্থল 'অট্টহাস' শুধু একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামই নয়, মহাতীর্থ-স্থানও বটে। একান্ন মহাপীঠের অন্যতমা মহাদেবী মা ফুল্লরা এখানে নাকি প্রত্যক্ষ জাগ্রত দেবতা, মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিতে সাক্ষাৎ কল্পতরু। বৃষ্টির জন্য তাঁহারই পূজার উদ্যোগে দশখানা গ্রাম একত্রিত হইয়া বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিল। ষোড়শোপচারে পূজা, বরুণ মন্ত্র জপ, অর্দ্ধমণ ঘৃতধারায় হোম, পঞ্চাশ কলসী গঙ্গাজলে দেবীর স্নান, পাঁচটী বলি, অষ্ট প্রহর ব্যাপী হরিনাম ইত্যাদি আয়োজনের মধ্যে এতটুকু ত্রুটী কোথাও রাখা হইল না।

পূজার দিন দশখানা গ্রামে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হইতেই সঙ্কীর্ত্তনের দলের খোল করতাল ও সঙ্গীতের কলরোলে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। অসঙ্গত চীৎকারে সঙ্গীত ও সঙ্গতের মধ্যে সঙ্গতি এতটুকু ছিল না, বিপুল ব্যগ্রতায় প্রাণপণে সকলে চীৎকার করিতেছিল। এদিকে দেবীর মন্দিরেও সমারোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একদিকে চণ্ডীপাঠ হইতেছে, নাটমন্দিরে হোম আরম্ভের উদ্যোগ চলিতেছে, মন্দির-দ্বারে পঞ্চাশ কলসী গঙ্গাজল সারি সারি সাজান--দেবীর স্নান হইবে। প্রাঙ্গণে হাড়িকাঠে আবদ্ধ বাচ্চা পাঁঠাগুলি চীৎকার করিতেছে, ভোগমন্দিরে রান্নাও চাপিয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্যের কথা—দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা নাগাদ আকাশে মেঘও দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকের উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া গেল। সঙ্কীর্ত্তনীয়ারা

যাহার যতখানি শক্তি ততখানি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। পুরোহিতদেরও মন্ত্রোচ্চারণ ক্রমোচ্চ এবং ঈষৎ দ্রুত হইয়া উঠিল, হোমাগ্নিতে ঘৃতধারা নৈবেদ্য অধিক পরিমাণে পড়িতে আরম্ভ করিল।

আকাশে মেঘ ঘন হইয়া উঠিল! গৃহস্থেরা বলিল, যে সে দেবতা নয় মা, মা ফুল্লরা কাঁচা দেবতা! কপালে হাত ঠেকাইয়া মেয়েরা দেবীকে প্রণাম করিল। মধ্যবিত্ত জমিদার বাড়ির মেজকর্ত্তা দেবীমন্দিরের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে একা বসিয়া জপ করিতেছিলেন। সম্মুখে একটা বোতল ও নারিকেল মালার পাত্র, একটা পাতায় কয়েক কুচি নারিকেল, মুঠাখানেক মুড়ি; ঐ গুলির সহযোগে জপের সহিত তাঁহার তর্পণ চলিতেছিল। মেঘ দেখিয়া পুলকে বিহ্বল হইয়া জপ তর্পণ ছাড়িয়া আপন মনে সেই নির্জ্জনে সত্য সত্যই নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন; মুখে বলিতেছেন, হোমাকারে ধূমাকার—ধূমাকারে মেঘাকার—মেঘাকারে জলাকার। লেগে যা কাড়ান, লেগে যা বাবা!

মন্দিরের সম্মুখে দেবী সায়রের বাঁধাঘাটে বেলগাছের ছায়াতলে বসিয়া একদল গাঁজা টানিতেছিল, তাহার মধ্যে শূলপাণি পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল, আয়, আয়, চলে আয়, সন্-সন্-সন্-সন্! চিড়িক্ কড়-কড়-কড়, ঝম-ঝম-ঝম-ঝম!

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, এই লাও কেনে বন্ধু, দিচ্ছি ভাসিয়ে আজ সব। বাড়ী যাবার সময় চল কেনে চবাং চবাং ক'রে জল ভেঙে!

অতিরিক্ত নেশা করিয়া চন্দ্রনাথের মাথা খারাপ, সে বলিয়া উঠিল, বাইশ টাকা আট আনা ছ' পাই দু' কড়া দু' ক্রান্তি কালেকটারী—বারো আনা রোডসেস, নিশানাথ মায়ের ভক্ত, জল না হ'লে হবে কেনে? 'কিষ্ণবন্ন' ছাগ, কালো আঁধার মেঘ!

তাহার অর্থ, তাহার ভাই নিশানাথের কয় কড়া কয় ক্রান্তির জমিদারী আছে, ঐ বাইশ টাকা কয় আনা কয় পাই তাহার রাজস্ব লাগিবে; সুতরাং জল না হইলে চলিবে কেন? প্রজারা খাজনা দিবে কেমন করিয়া? আর বলির ছাগলগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের, সেই জন্যই কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেছে।

ওদিকে রান্নাশালায় কে চীৎকার করিতেছিল, কাঠ ভিজে যাবে, কাঠ ভিজে যাবে! এই বেটারা, তালপাতা কেটে নিয়ে আয় দেখি। ই-দিকে তো সব সার দিয়ে বসে আছ সব, খাবার সময় তো ছিঁড়ে খাবে! যা সব তালপাতা নিয়ে আয়!

মোট কথা আকাশে না হইলেও লোকের উৎকণ্ঠিত মনে বৃষ্টি আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেবতার সে নিষ্ঠুর পরিহাস না কি আবার আধঘণ্টার মধ্যেই আকাশ একরূপ পরিষ্কার হইয়া গেল।

জঙ্গলের মধ্যে মেজকর্ত্তা আবার জপ তর্পণে বসিয়া বলিলেন, ইকি নক্কা আরম্ভ করলে না কি?

শূলপাণি হতাশায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঊর্ধ্বমুখে আস্ফালন করিয়া উঠিল, দোব এক ত্রিশূলের খোঁচা!

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, দাঁড়াও বন্ধু, উতলা হলে চলবে কেন? মায়ের গায়ে জল ঢাল আগে, তবে মা জল ঢালবে!

চন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, হু হু, আঁচাতে হবে, আঁচাতে হবে, রক্ত থাক—রুধির রুধির। তবে তো আঁচারে!

গোঁসাইজীর জমিজমা নাই, তবু সে আসিয়াছিল—নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি, যে কোন হুজুগে সে আছেই, সে একা দাঁড়াইয়াছিল পুকুরটারই ওপারে। সে কয়েকবার মৃদু ফুৎকার দিয়া বলিল, ফু, ফু! উড়ে যা, উড়ে যা! ছাতা কিনবার পয়সা নাই বাবা, ফু, ফু! আর দুটো মাস বাবা, ভাদ্র পর্য্যন্ত পার ক'রে দাও! ব্যস, নিয়ে নিয়েছি সব বেটাকে, সব সমা—ন ক'রে দোব। ফু, ফু—

এই সময় চণ্ডীচরণ রায় টলিতে টলিতে আসিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া দেহ, গায়ের রঙ কালো, বিশৃঙ্খল দাড়ী গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মোটা মোটা চোখ দুইটা ঘোর লাল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় একছড়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। চণ্ডীচরণের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হয়, তাহার কণ্ঠস্বরও দেহের মত ভয়াবহ। মন্দিরপ্রাঙ্গণে করজোড়ে দাঁড়াইয়া ভীষণ কণ্ঠে সে নিবেদন করিল, আমি মা রাজার ছেলে প্রণাম নাহি জানি, কেমন করে করব প্রণাম দেখিয়ে দাও গো তুমি। বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রণাম করিল।

পুরোহিত হাসিয়া বলিল, আসুন, আসুন, রায়মশায় আসুন! আজ এত দেরী যে!

চণ্ডী রায় তান্ত্রিক, দেবী-মন্দিরের নিত্যযাত্রী। রায় বলিল, কাল শ্মশানে গিয়েছিলাম হে! অমাবস্যা ছিল কি না! ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম সেইখানে গাছতলায়, এই ঘুম ভাঙল, নদীতে স্নান করে পথে পথে আসছি! কিন্তু এ সব কিহে বাপু, এ সব দক্ষযজ্ঞ কিসের হে?

পুরোহিত বলিল, জলের জন্যে হোম পূজা বলি হচ্ছে আজ!

রায় বলিল, জল হয়ে হবে কি, জল নিয়ে সব করবে কি হে বাপু?

পুরোহিত হাসিয়া বলিল, এই দেখুন, জল হ'য়ে নাকি হবে কি? ধান হবে, দেশে অভাব ঘুচবে!

পুরোহিতের নাকের ডগার কাছে বুড়া আঙ্গুল নাড়িয়া দিয়া রায় কহিল, কচু জান তুমি! বলি, পঙ্গপাল দেখেছ?

দেখেছি বৈকি। কৈ পাঁজীতে তো কিছু লেখা নাই, এবার কি পঙ্গপাল আসবে না কি?

আসবে না কি? পঙ্গপাল যে এখানে জন্মাচ্ছে হে বাপু! বলি, ছেলেপিলের ঝাঁক দেখেছ? বেটারা সব বিয়ে করছে আর পঙ্গপালের ঝাঁক বাড়াচ্ছে, সব বেটার একটা করে বিয়ে করা চাই! কালী কালী, বল মন কালী কালী! বলিয়া রায় মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূজায় বসিল। পুরোহিত হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দশখানা গ্রামের সঙ্কীর্ত্তন দল একত্রিত হইয়া বাদ্যধ্বনিতে চীৎকারে সে এক তুমুল তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। চণ্ডী রায় সবে তখন ধ্যানে বসিয়াছে। সে তাণ্ডব চীৎকারে বার বার তাহার ধ্যানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সে পূজা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ভীষণ কণ্ঠে বিভীষণ চীৎকার করিয়া কহিল, থাম বেটারা, থাম সব। বলি ও হচ্ছে কি?

এত উচ্চ কলরবের মধ্যেও চণ্ডী রায়ের কণ্ঠস্বরের চীৎকার ব্যর্থ হয় নাই—সঙ্কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়ের অগ্রবর্ত্তী দলের কানে গিয়াছিল। তাহারা ভয়ে থামিয়া গেল। তাহারা নীরব হইল দেখিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎবর্ত্তী দলগুলিও নীরব হইল।

রায় বলিল, চেঁচালে জল হয়, ওরে বেটারা চেঁচালে জল হয়? তার চেয়ে খোল আন, করতাল আন, এনে মা ফুল্লরার মাথায় মার! ওদিক হইতে শূলপাণি ও চন্দ্রনাথ উঠিয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথ ফড়িংএর মত দেহ লইয়া লাফ দিয়া উঠিল—উড়ো খৈ, উড়ো খৈ, তুমি ফুঁ দিলে উড়ে যাবে! জমিদারমালিক তিন গণ্ডা দুকড়া দুক্রান্তি রকম, আমরা সেবাইত মায়ের, আমাদের হুকুম—লাগাও হরিনাম।

শূলপাণি আস্তিন গুটাইয়া বলিল, তুমি হরিনাম বন্ধ করবার কে হে বাপু?

চণ্ডী রায়ের এতক্ষণে চেতনা ফিরিয়া আসিল, এই দেবস্থানের সেবাইত মালিক এখানকার স্থানীয় জমিদারগণ, সাধারণের সহিত তাহারও এখানে কোন অধিকার নাই—কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ধীরে ধীরে পূজার ঝোলাটি কাঁধে ফেলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। রাস্তার দুই ধারে অনাহারশীর্ণ ভিক্ষুকের দল প্রসাদের আশায় সারি দিয়া বসিয়া আছে, মন্দির-প্রত্যাগত রায়কে দেখিয়া তাহারা কাতর স্বরে আরম্ভ করিল—

একটা পয়সা দিয়ে যান বাবা!

খেতে পেচ্ছি না বাবু!

বাবু, রাজাবাবু!

মরতে বসেছি বাবা—

রায় বলিল, মরতে বসে, বসে আছিস কেন রে বেটা, মরেই তাই যা না কেন! দেশ ঠাণ্ডা হোক। মর মর, সব কলেরা হয়ে মর। ভীষণ-মূর্ত্তি ব্যক্তিটির ভয়াল কণ্ঠের ওই কঠোর কথাগুলি শুনিয়া তাহারা সভয়ে নীরব হইয়া গেল। গ্রামে ঢুকিয়া রায় আসিয়া উঠিল মদের দোকানে।

গিরে, ওরে গিরীশ!

গিরীশ সাহা মদের দোকানের 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার'; সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আসুন আসুন, কত্তা আসুন।

নিয়ে আয় বেটা দুটো বোতল, আর নিরিবিলি দেখে দে তো একটা জায়গা করে, খানিকটা সুধা ছিটিয়ে ঠাঁইটায় হাত বুলিয়ে দে!

গিরিশ ভক্তিসহকারে রায়কে ভিতরে লইয়া গেল।

দোকান হইতে রায় যখন বাহির হইল তখন দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইতে চলিয়াছে। রায়ের পদক্ষেপের আর বেশ ঠিক ছিল না, দেবীমন্দিরের ওই নিষ্ঠুর অপমানের আঘাতে সে অতিরিক্ত নেশা করিয়াছিল। গিরীশ বলিল, বাড়ীতে দিয়ে আসব কত্তা!

রায় ধমক দিয়া বলিল, চোপরও বেটা! হাঁটি হাঁটি পা পা ধর তো মা কালী, হাত ধর তো মা! দেখিয়ে দাও বেটাদের কার মা তুমি! সাবধানে

অতি মন্থর গমনে কোনরূপে দেহের সমতা বজায় রাখিয়া টলিতে টলিতে সে অগ্রসর হইল। কিছু দূর গিয়াই গলিটা শেষ হইয়া গেল, বড় রাস্তায় উঠিয়া রায় দেখিল কলরব করিতে করিতে ভিখারীর দল দেবীস্থান হইতে ফিরিয়া চলিয়াছে। ছোট ছেলেদের কান্নায়, মেয়েদের গালিগালাজে, পুরুষদের আক্ষেপে অনাবৃষ্টির রুক্ষ স্তব্ধ শ্রাবণ দ্বিপ্রহর অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কোনরূপে একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রায় প্রশ্ন করিল. ওরে বেটা হারামজাদারা. এত চেঁচাস কেন তোরা?

এক সঙ্গে দশজনে দশটা উত্তর দিয়া উঠিল, খিদের জ্বালা বাবা।

ঠাকুর পুজো ক'রে নিজেরা খেলে ভিখারীকে একটা এঁটো পাতাও দিলে না. সব দিলে নিজেদের রাখাল বাগালকে। গাল দেবো না আমরা!

খিদের জ্বালায় ছেলেরা কাঁদছে বাবু, কি করব বল!

হবে, জল হবে. ভাল করে হবে! দীনদুঃখীর ওপর দয়া নাই, দেবতা জল দেবে কেনে! কই দিক তো দেখি!

ছেলের দল কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, এ্যাঁ এ্যাঁ ভাত, এ্যাঁ এ্যাঁ। রায় চোখটা একবার বিস্ফারিত করিয়া ওই বুভুক্ষুর দলের দিকে চাহিয়া বলিল. আয় বেটারা, আয় সব আমার বাড়ী। সব নেমন্তন্ন তোদের, আয়!

ভিখারীর দলটি নেহাৎ ছোট ছিল না। ছেলে মেয়ে লইয়া প্রায় পঁচিশ জন হইবে, তাহারা এতগুলি লোক একটা বাড়ীতে গিয়া এই অবেলায় ভাত পাইবে এ বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশেষ মাতালের নিমন্ত্রণ! তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মীমাংসা খুঁজিতেছিল।

রায় বলিল, আয় বলছি, নিব্বংশের বেটারা আয়।

একজন বলিল, চল্‌রে সব চল. এম্‌নেও উপোস অম্‌নেও না হয় তাই হবে, চল সব!

ভিখারীর দল রায়ের পিছন ধরিল।

রায় বাড়ীর দরজায় আসিয়া বন্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, চেন্‌কা! এই হারামজাদী চেন্‌কা!

চেন্‌কা হইল চিন্ময়ী, চণ্ডী রায়ের বিধবা ভাগিনেয়ী। আজন্ম অবিবাহিত, স্বজনবিহীন চণ্ডী রায়ের উদাসীন জীবনে এই চিন্ময়ীই মমতার স্বর্ণসূত্র,

চিন্ময়ী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল. মামার প্রতীক্ষাতেই অভুক্ত অবস্থাতে সে এখনও বসিয়াছিল।

চণ্ডী রায়ের পিছনে পিছনে পিল পিল করিয়া ভিখারীর দল বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল। চিন্ময়ী সবিস্ময়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, ওই, ওই! সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে তাহারা বলিয়া উঠিল, ওই, ওই কর না গো ঠাকরুণ, বাবু আমাদিগে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আইচে!

চিন্ময়ী নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চণ্ডী রায় তখন কোঠাঘরের পাকা বারান্দাটার উপর শুইয়া পড়িয়াছে। সে বলিল, ভাত চাপিয়ে দাও মা, হারামজাদাদিগে নেমন্তন্ন করে এনেছি।

চিন্ময়ী এবার মৃদুস্বরে বলিল, ধান-ভানাড়ী যে চাল ভেঙে খেয়েছে, ঘরে যে চাল নাই।

চণ্ডী রায়ের চোখ তখন মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে, তবু সে বলিল, গুলু দত্তকে ডাক মা। ধানের ওপর টাকা নিয়ে চাল কিনে আন।

চিন্ময়ী বলিল, তা তো হ'ল, কিন্তু ভানাড়ীর একটা ব্যবস্থা কর।

রায় উত্তরে যে কি বলিল কিছু বোঝা গেল না। চিন্ময়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। এমন বহু ঝঞ্ঝাটই তাহাকে মামার জন্য পোহাইতে হয়। সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া সেই শেষ দ্বি-প্রহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া গুলু দত্তের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

ভিখারীরা তখন খামার বাড়ীর উঠানে আসর জমাইয়া বসিয়া কলরব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ওদিকে অগাধ ঘুমে চণ্ডী রায়ের নাক ডাকিতেছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ীও নিস্তব্ধ।

রায়ের উঠানে দুইটা পরিপূর্ণ ধানের মরাই, তাহারই পাশে আবার কয়টা ছেলে লাঠি খেলা জুড়িয়া দিয়াছিল। একজন ভিখারী সহসা বলিল, এই ছোঁড়া, লাঠি গাছটা দেতোরে!

লাঠি গাছটা লইয়া সে সজোরে খড়ের গুড়ল বাঁধা ধানের মরাইয়ের মধ্যে ভরিয়া ফুটা করিয়া দিল, তারপর তলায় একখানা কাপড় পাতিয়া লাঠি গাছটা টানিয়া বাহির করিয়া লইতেই ঝুর ঝুর করিয়া ধান ঝরিয়া কাপড়ের আঁচলখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের কথা অন্য কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না, বিস্ময় প্রকাশ করিল না, আপন আপন গামছা কাপড় লইয়া সকলে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। একজন তাড়াতাড়ি গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া

আসিল। একজন শুধু বলিল, বেশী লয়, বেশী লিস না, চারটি করে লে, ধরা পড়বি!

একের পর এক করিয়া সকলের আঁচল পূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে ছিদ্রপথে খানিকটা খড় গুঁজিয়া দিয়া ছিদ্রটা একজন বন্ধ করিয়া দিল।

তাহার পর ধানের পোঁটলাগুলি যথাসম্ভব গোপন করিয়া বসিয়া ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চিন্ময়ীর আগমন পথের দিকে চাহিয়া তেমনি কলরব করিতে লাগিল।

একজন ইহারই মধ্যে দরজাটাও খুলিয়া দিয়া আসিয়াছে।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই চণ্ডী রায় এক কালীবাড়ীর বনিয়াদ পত্তন করিয়া দিল; সে কালীপ্রতিষ্ঠা করিবে। গতকল্যকার অপমানটা তাহার বুকে বড়ই বাজিয়াছে। খামার বাড়ীতে বনিয়াদ কাটাইতে গিয়া সে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ফিরিয়া আসিল। চিন্ময়ী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে কঠোর কণ্ঠে কহিল, বলি চেন্‌কা, হারামজাদী, খামার বাড়ীতে এত এঁটো-পাতা কিসের? পাতাগুলো বাইরে ফেলতে পার না?

চিন্ময়ী বলিল, তা বটে, হাড়ি, ডোম, মুচি, মুদ্দোফরাসের এঁটো পাতাও আমাকে ফেলতে হবে। আমার এমনি কপালই বটে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চণ্ডী রায় বলিল, হাড়ি, ডোম এলো কোথা হতে রে বাপু?

কেন, কাল যে সব নেমন্তন্ন করে এনেছিলে, মনে নাই?

এবার রায়ের সব মনে পড়িয়া গেল, এতক্ষণে সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, খেতে পেয়েছিল তারা?

না, আমি একা বুঝি এতগুলো পাতায় ভাত খেয়েছি? অতিথিরা কি শুধু খেয়েই গিয়েছে, দক্ষিণে স্বরূপ দু'দিনের খোরাকও সব জোগাড় ক'রে নিয়ে গিয়েছে! মরাই ফুটো ক'রে সব ধান বার ক'রে নিয়েছে।

তুই কি করছিলি, তুই? চোখ দুটো ছিল কোথা?

চোখ ছিল ওপরে, পোড়ারমুখো ভগবানকে খুঁজছিলাম। বলি আমার কম্মভোগটা দেখে যা মুখপোড়া চোখখেগো! আমি দত্তর বাড়ী গিয়েছি, সেই ফাঁকে সব নিয়েছে. তারপর আমি রাঁধব, না লোকের পোঁটলা দেখব, কি তোমার মরাই দেখব, বল দেখি?

এবার রায় বলিল, তা নিয়েছে বেশ করেছে! ওদের তো ভাগ আছে রে বাপু, নিবে বৈকি।

চিন্ময়ী অবাক হইয়া গেল। রায় বলিল, ধান-ধন কি তোর একার রে বাপু? আগুন, চোর, জল, মাটী, ভিখেরী, রাজা এদের সবারই ভাগ আছে। নিয়েছে সব, বেশ ক'রেছে, আজ থেকে পাঁচটা ক'রে ভিখিরীকে আমি খেতে দেব, বুঝলি!

পাঁচটা কেন, পঞ্চাশটাকে খেতে দাও তুমি! আমার তো গতরে খাটা নিয়ে কথা!

রাগ করিস না রে বাপু, রাগ করতে নেই।

না, না, রাগ আমি করি নাই মামা, আমি ভাল কথাই বলছি। তুমি খেতে দেবে আর আমি ক'রে-কম্মে দিতে পারব না। পুণ্যি না হয় তোমারই হবে, আমার হাতও তো ধন্যি হবে! 'যার ধন তার পুণ্যি, যে দেয় তার হাত ধন্যি!'

সাধে কি তোকে মা বলি চেনকা! এই আমার কালীকে বলি মা—আর তোকে বলি মা!

একটা ছোট মেয়ে দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া এই সময় বলিল, আজ চারটী ভাত আর দেবা না ঠাকরুণ?

চিন্ময়ী বলিল, এই যে, এস একবার—'এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যান্নন' দোব তোমাদিগে। তুইও তো কাল ছিলি!

বারবার ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটা বলিল, না ঠাকরুণ, মা কালীর দিব্যি আমি আজ নতুন আইচি; তোমাদের ধান আমি লিই নাই!

চিন্ময়ী হাসিয়া ফেলিল, মেয়েটা নাছোড়বান্দা—হেই ঠাকরুণ, তোমার দুটী পায়ে পড়ি গো, চারটী ভাত দিয়ো গো!

আহারের সময় পাঁচের স্থানে বারো জন হইল। চিন্ময়ী বলিল, তবু ভাল, কাল যারা ধান চুরি করেছে তারা সবাই আসতে পারে নি। কিন্তু এ দিয়ে তুমি কুলিয়ে উঠতে পারবে না মামা, বিষয়সম্পত্তি বেচেও পারবে না!

রায় বলিল, যাক্ গে বিষয়! ও বিষ আমি গেলেই বাঁচি! কালী কালী ব'লে বেরিয়ে পড়ি!

চণ্ডীচরণ এখানকার এক প্রাচীন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক পণ্ডিত বংশের সন্তান।

তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে এখানে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। রায় বংশের কোন এক সাধক নাকি মত্ত অবস্থায় ছাগশিশু ভ্রমে একটা কুকুরকে বগলে পুরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বলি দিবার জন্য। লোক সেজন্য তামাসা করিলে তিনি কুকুরটাকে নাকি ছাগশিশুতেই রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আর একজন না কি ভ্রমক্রমে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভক্ত সাধকের মান বজায় রাখিবার জন্য স্বয়ং কালী না কি আপন কঙ্কণ তুলিয়া ধরিয়া আকাশে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাক সে সব কথা। চণ্ডীচরণও জীবনের প্রথম হইতেই কেমন উদাসীন, বিবাহ সে করে নাই, সমস্ত জীবন তন্ত্র সাধনা, জপতপ লইয়াই কাটাইয়া চলিয়াছে। তাহার বিষয় সম্পত্তিও ভালই ছিল। কিন্তু অনেকটাই এখন গিরীশ সাহার কবলগত, তবুও এখনও যাহা আছে সেও কম নয়। আরও একটা বড় কথা, ভূমির কর চণ্ডী রায়কে দিতে হয় না, সবই ব্রহ্মত্র এবং লাখেরাজ। কিন্তু সেই বা কে দেখে যত্ন করে, লোকে বলে সোনাতে মাটীতে রায়ের নিকট কোন প্রভেদ নাই।

কথা সত্য। খামারবাড়ীতে কালীমন্দিরের ঘর আধ খানার উপর তুলিয়া সে ঘর রায় ভাঙিয়া দিল। মন্দিরের স্থান রায়ের আর পছন্দ হইল না। এই জনকোলাহলের মধ্যে শ্মশানবাসিনীর আসন রচনা করা ভুল, গ্রামের বাহিরে শ্মশানেরই অনতিদূরে নির্জ্জন প্রান্তরে রায় আবার নূতন করিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

চিন্ময়ী বলিল, এতগুলো টাকা জলে পড়ল মামা!

মামা উত্তর দিল, জলের তলাতেও তো মাটী আছে রে বাপু, ডুবতে ডুবতে গিয়ে শেষে মাটীতেই পড়বে, ভাবিস্ নে।

ঈষৎ বিরক্তিতে চিন্ময়ী বলিল, কিন্তু এমন ক'রে খরচ করলে শেষ পর্য্যন্ত খাবে কি।

উত্তর হইল, খাবি। শেষে ত খাবি খেতেই হয়, না হয় দুদিন আগে থেকেই খাবি রে বাপু!

তা তোমার যদি ভাল লাগে, তবে তাই খাবে, কিন্তু সবারই তো ভাল লাগবে না, আমাকে এইবার বিদেয় দাও বাপু!

ওরে হারামজাদা, বিদেয় দিতে দিনক্ষণ না হয় নাই লাগল, কিন্তু উদ্যোগ

ত চাই! বাঁশ চাই, দড়ি চাই, কাঠ চাই, ঘী চাই ও তোর আট অঙ্গে আট কড়া কড়িও চাই। সে সব মজুত হোক, তারপর হবে!

এবার চিন্ময়ী হাসিয়া বলিল, সেই আশীর্ব্বাদই কর মামা, যেন তোমাকে রেখেই আমি যাই।

তারপর অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, কিন্তু তোমাকে ফেলে যেয়েও তো আমার সোয়াস্তি হবে না! আমি গেলে তোমার দশা কি হবে, তাই যে ভাবি!

চণ্ডী রায় বলিয়া উঠিল, কালী কালী-বল মন, কালী-কালী!

তারপর উভয়েই নীরব, নিস্তব্ধ ঘরখানার মাথায় একটা কাক শুধু কা-কা শব্দে চীৎকার করিতেছিল; একটা টিকটিকি টক্ টক্ শব্দে ডাকিয়া উঠিল।

হাতের মধ্যমা আঙুলটি দিয়া মাটীতে টোকা মারিয়া আপন ললাট স্পর্শ করিয়া চিন্ময়ী বলিল, তোমাকে ফেলেই আমাকে যেতে হবে মামা। টিকটিকি বলছে!

রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল. চিমটেটা দে তো টিকটিকির 'নেতার' মারি!

চিন্ময়ী হাসিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া রায় বলিল, হাসতে ভালও তো লাগে দিন রাত, ফ্যা ফ্যা ক'রে! দে, আমার আহ্নিকের ঝোলাটা দে, ডাঙ্গাতে ঘরের কাজ দেখে একেবারে নদীতে স্নান তর্পণ সেরে আসব।

রায়ের উদ্যোগে, প্রাণপণ চেষ্টায় কার্ত্তিকী অমাবস্যার পূর্ব্বেই কালীবাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া গেল। পরমানন্দে রায় আপনার ইষ্টদেবীর পূজার বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিল।

চিন্ময়ী বলিল, তোমার কালীপুজো হবে আর আমার হাড় কালী হ'ল। আমি আর পারছি না মামা!

রায় বলিল, আচ্ছা চেন্‌কা, আমার মা কি তোর সতীন নাকি? আমার মায়ের পুজোয় তোর এত হিংসে কেন বল্ দেখি?

চিন্ময়ী বলিল, তা তো বলবেই গো! খাওয়ান, দাওয়ান, সেবাযত্ন সমস্ত করছি আমি; আমি হ'লাম সৎমা, কেমন? আর ম'রে গেলেও যে সাড়া দেয় না, সে-ই তোমার হ'ল আপন মা, নয়? তোমার দোষ কি বল, কলিকালের দোষ!

য়া ব'লেছিস চেন্‌কা, এবার বেটীর সঙ্গে যা-হয় একটা বোঝা-পড়া করব, দাঁড়া না তুই!

চাল এনেছি ঠাকুরমশায়!

একজন ভাগ-জোতদার পূজার ব্রাহ্মণ ভোজনের চাল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে চাল ডাল তরী-তরকারী প্রভৃতি দ্রব্যে পূজার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাটোয়া হইতে কারিগর আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। আয়োজনের কোথাও এক তিল অভাব রহিল না।

পূজার দিন সন্ধ্যার সময় রায় আসিয়া ডাকিল, চেন্‌কা!

চিন্ময়ী বাহিরে আসিয়া মামাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা তাহার মুখে আসিল না! চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাসীর বেশ, অঙ্গে গেরুয়া, হাতে চিমটা। টপ টপ করিয়া চিন্ময়ীর চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

রায় হাসিয়া বলিল নে, এইটে রাখ দেখি! একখানা দলিল চিন্ময়ীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়া ধরিল।

চিন্ময়ী এতক্ষণে বলিল, এই তোমার শেষ পর্য্যন্ত মনে ছিল মামা?

হাসিমুখেই রায় বলিল, নে নে ধর্ না হারামজাদী, আমাকে মুক্ত কর দেখি; কত কাজ আমার বাকী!

চিন্ময়ী দলিলটা লইয়া বলিল, এটা আবার কি?

ও একটা দলিল।

চিন্ময়ী লেখা-পড়া জানিত। দলিলখানা রাখিতে গিয়া আলোকের সম্মুখে সেখানা খুলিয়া দেখিয়া সমস্তটা না পড়িয়া পারিল না। দলিলখানা একখানা দান-পত্র, চণ্ডীচরণ রায় মানসিক বৈরাগ্য হেতু এবং দেবীসাধনায় পরিপূর্ণ অবসর প্রাপ্তির কামনায় গৃহত্যাগ করিতেছেন, সেই হেতু তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয়ী চিন্ময়ী দেবীকে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দান করিতেছেন। চণ্ডী রায় লিখিয়াছেন, স্নেহে তুমি আমার আপন কন্যারও অধিক—মমতায় যত্নে আমার মায়ের মত মমতাময়ী, তুমি ছাড়া আমার আপনও কেহ নাই, ইত্যাদি।

ঘরের মধ্যে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্ময়ী খানিকটা কাঁদিল, তারপর বাহিরে আসিয়া ডাকিল, মামা!

চণ্ডী রায় তখন কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছে। চিন্ময়ী দলিলখানা তুলিয়া রাখিয়া আবার কাজে মন দিল। ওই লইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর তখন ছিল না। সমস্ত পূজাটা মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রায় নিজে পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক, নিজেই ব্রতী হইয়া সে পূজায় বসিল। অঞ্জলি দিতে দিতে চোখের জলে রায়ের বুক ভাসিয়া গেল। মুগ্ধ হইয়া লোকে পূজা দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ, নিজে সাধক না হলে পূজো!

এদিকে চিন্ময়ীর বন্দোবস্তে ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্র ভোজন সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় রায়কে লইয়া চিন্ময়ী এক বিষম বিপদে পড়িল। মদ্য-বিভোর রায় শিশুর মত কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—মা, আমার মা, ওরে তোরা আমার মাকে নিয়ে যাস নে! আমার মা, আমার মা!

চিন্ময়ী বাতাস করিয়া শান্ত করিতে করিতে বলিল, এমন কর তো মামা আমি চলে যাব!

অতঃপর রায় ওই গ্রামপ্রান্তস্থ কালীমন্দিরেই সন্ন্যাসীর মত বসবাস আরম্ভ করিল। ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল একমুঠা আহারের সময়। সেই সময়টিতে একবার বাড়ীতে আসে, আবার আহার করিয়াই চলিয়া যায়। রাত্রে চিন্ময়ী এটা-ওটা পাঠাইয়া দেয়।

সেদিন প্রাতঃকালে গিরীশ সাহা আসিয়া রায়কে প্রণাম করিয়া বসিয়া বলিল, আহা—হা মনোরম জায়গা হয়েছে কত্তা! সাধনের জায়গা এই বটে! কিন্তু রাত্তিরেই যা ভয়!

রায় বলিল, মায়ের স্থান রে বেটা, ভয় কি, বলি ভয়টা কিসের! তারপর কি মনে ক'রে এলি?

কাপড়ের ভিতর হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া সসম্ভ্রমে নামাইয়া দিয়া গিরীশ নিবেদন করিল, আজ্ঞে, এইবার একবার দয়া করুন, অনেক টাকা বাকী হ'ল।

কত রে?

তা আজ্ঞে শ'য়ের কাছাকাছি, আশি প'চাশি হবে! কালীপুজোর 'দাব্য'র খরচও ওরই মধ্যে আছে কি না!

আচ্ছা, কাল সকালে আসবি, কবে পাবি বলে দোব।

গিরীশ প্রণাম করিয়া যাইতে যাইতে বলিল, এইবার জবাফুলের গাছ গোটাকতক লাগিয়ে দেন কত্তা!

রায় সেদিন আহার করিতে বসিয়া বলিল, চেন্‌কা, গোটা আশি টাকা চাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্ময়ী বলিল, এত টাকা আমি কোথা পাব?

আরে গিরীশ পাবে!

তা তো বুঝলাম গিরীশ পাবে। কিন্তু আমি পাব কোথা?

হাতে না থাকে ধান বেচতে হবে। গুলো দত্তকে বলে রাখবি আজ?

ধান আমি বেচতে পারব না বাপু! এবার তো ধান-পানের এই গতিক, ধান বেচলে খাব কি?

বিরক্ত হইয়া রায় চিন্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল, তার মানে?

মানে আবার কি? পেটে খেতে হবে তো? বরং সেই দর-টর উঠলে, হিসেব করে ধান বাঁচে তো তখন বেচব।

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া রায় বলিল, বেশ, গিরশেকে কিছুদিন সবুর করতেই বলে দোব।

পরদিন গিরীশ আসিলে তাহাকে সেই কথাই রায় বলিয়া দিল। একগাছা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গিরীশ বলিল, আমি আজ্ঞে আর থাকতে পারব না। তারপর নতমুখে গোটা কয়েক পিঁপড়ে টিপিয়া টিপিয়া মারিয়া গিরীশ আবার বলিল, তবে না হয় এক কাজ করুন কত্তা, 'দলদলি'র জোলের ওই পনের কাঠা জমিটা আমাকে দিয়ে দেন। আমার জমির পাশেই বটে, ওতেই না হয় আমি সেরে নেব। রায় খুশী হইয়া বলিল, বেশ বেশ, তাই তুই নিগে যা।

গিরীশও পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু দুই দিন পরেই আবার আসিয়া বলিল, এ কি কাজ কত্তা? জমি আমাকে দিলেন, লেখা-পড়া না হয়

নাই হয়েছে! কিন্তু আমার লোক উঠিয়ে দিলেন কেন চিনুদিদি? বলেন, আমার জমি!

রায় বলিল, ও হো-হো, আমারই ভুল রে, চেন্‌কাকে এখনও বলা হয় নাই। আচ্ছা, তা আজই বলে দোব আমি!

দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া রায় বলিল, ওরে চেন্‌কা, 'দলদলি'র জোলের পনের কাঠা জমিটা আমি গিরীশকে দিয়েছি। ওতেই ওর দেনা শোধ হবে।

চিন্ময়ী বলিল, না, জমি দেওয়া হবে না বাপু।

বিরক্ত হইয়া রায় বলিল, সে কি ক'রে হবে, তাকে আমি দিয়েছি।

তুমি দিলে কি হবে মামা? জমি তো তোমার নয় যে তুমি দেবে!

আমার নয়! সবিস্ময়ে রায় চিন্ময়ীর মুখের দিকে চাহিল। চিন্ময়ী বলিল, তোমার কিসের শুনি? আমাকে দান-পত্র লিখে দাও নাই তুমি? দত্তধনে কি স্বত্ব থাকে না কি?

রায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, ও, সেদিন তাই বুঝি বল্‌লি, ধান বেচতে দোব না।

সঙ্গে সঙ্গে রায় আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। চিন্ময়ীও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন মনেই বলিল, তা আসল কথায় রাগ করলে আর করব কি বল? সম্পত্তি এখন আমার, আমি যদি না দিই! আর গিরীশকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে না কেন, দিতেই যদি হ'ত, আমিই দিতাম।

রায় গর্জ্জিয়া উঠিল—তোর তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে আমাকে?

ঘর হইতেই চিন্ময়ী বলিল, কে বলছে বাপু তাঁবেদার হয়ে থাকতে! আমি বলছি, আমার সম্পত্তিতে তুমি হাত দিও না। সে অধিকার তোমার আর নাই!

আমার অধিকার নাই! আমি কেউ নই!

চণ্ডী রায় দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল; এ বাড়ীর তলস্থ মৃত্তিকা যেন অগ্নিকুণ্ডের মত অসহনীয় বোধ হইতেছিল। মন্দিরে আসিয়া সমস্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্রটা মাথায় করিয়া সে অস্থির পদে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইল।

সে কেহ নয়, কোন অধিকার তাহার নাই। ক্রোধে আক্ষেপে তাহার মস্তিষ্ক যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। অপরাহ্ণে সে আজ অসময়ে গ্রামে প্রবেশ করিয়া শিবু হালদারের বাড়ী আসিয়া উঠিল। শিবু হালদার জাল-

জালিয়াতি মামলা-মোকদ্দমায় বিচক্ষণ ব্যক্তি। রায় তাহাকে ধরিয়া বলিল, নিজের ঘরে চোরের মত, না—সে হবে না। এখন উপায় কি তাই বল শিবু!

কয়েক দিন পর। চিন্ময়ী তখন ঘরের মধ্যে রান্না করিতেছিল। সেদিন হইতে চণ্ডী রায় বাড়ীতে আহার করিতে আসা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। চিন্ময়ীও তাহাকে ডাকে নাই।

কে বাহির দরজায় ডাকিল, চিন্ময়ী দেব্যা আছেন, চিন্ময়ী দেব্যা!

কে গো? চিন্ময়ী দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল একজন আদালতের পেয়াদা। সে বলিল, একখানা সমন আছে আপনার নামে।

বিস্মিত হইয়া চিন্ময়ী বলিল, আমার নামে? কিসের সমন?

পেয়াদা বলিল, লিয়ে লেন, দেখিয়ে লিবেন কাউকে। সবই লিখা আছে ওতে।

চিন্ময়ী বলিল, ডাঙাতে কালীবাড়ীতে আমার মামা আছে। তাকেই দাও গে বাপু!

পেয়াদা আবার বলিল, তিনিই তো নালিশ করছেন গো! ওই যে তিনি গলিতে দাঁড়িয়ে রইছেন।

চিন্ময়ী দরজা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, সত্যই গলির মধ্যে তাহার মামা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে আর দ্বিধা করিল না; হাত বাড়াইয়া সমনখানা লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর আসিয়া সমনের সহিত গাঁথা আর্জ্জির নকলখানা পড়িয়া দেখিল, বাদী চণ্ডীচরণ রায় অভিযোগ করিতেছে যে, প্রতিবাদিনী চিন্ময়ী দেব্যা তাহার বিধবা ভাগিনেয়ী, তাহার বাড়ীতেই সে থাকিত। উক্ত চিন্ময়ী দেব্যা তাহাকে মদ খাওয়াইয়া মত্ত অবস্থায় তাহার যাবতীয় সম্পত্তি তাহার অনুকূলে দানপত্র লেখাইয়া লইয়াছে। তখন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। সুতরাং ন্যায়ত ধর্ম্মত ঐ দান-পত্র অসিদ্ধ। এ মতে প্রার্থনা, ঐ দান-পত্র নাকচ করিয়া সম্পত্তির ধর্ম্মত মালিক চণ্ডীচরণ রায়কে ফিরিয়া পাইতে আদেশ দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

চিন্ময়ীর মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল! কিছুক্ষণ নির্ব্বাক স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া সে কাগজ কয়খানা লইয়া চলিল পাড়ার দিকে।

যাইতে যাইতে সে আপন মনেই বলিল, আচ্ছা, আমিও দেখব। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, সম্পত্তি আমি দোব না। চিরকাল তোমার বাঁদী হয়ে থাকব, কেমন?—বেশ তো গিরীশকে তুই আমার কাছে পাঠালি না কেন?

সে গেল মামলাবাজ গোঁসাইজীর বাড়ি, ফুৎকারে যে মেঘ উড়াইয়া দেয়।

বহু মিথ্যাকথা চিন্ময়ী উকীলের নিকট পাখীর মত মুখস্থ করিয়া লইল, এতটুকু দ্বিধা করিল না! উকীল শিখাইয়া পড়াইয়া দিয়া বলিল, কই, কি বলবে, বল তো? আচ্ছা, তুমি যখন বিধবা হ'য়ে এলে তখন তোমার গয়না-গাঁটী কি সঙ্গে এনেছিলে?

চিন্ময়ী উত্তর দিল, হ্যাঁ, এনেছিলাম।

কত টাকা তার দাম তুমি বলতে পার?

হ্যাঁ। তা দু'হাজারের কিছু বেশীই হবে।

কেমন ক'রে জানলে?

আমার বিয়েতে দু'হাজার টাকার গয়নার চুক্তি ছিল। তা ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়ীতেও গয়না পেয়েছিলাম সে সবই তো সঙ্গে ছিল।

আচ্ছা, সে গয়না কি হ'ল?

সে সমস্ত আমার মামা নিয়েছে। তারপর সে টাকা না দিতে পেরে সমস্ত সম্পত্তি আমায় দান-পত্র লিখে দিয়েছে।

চণ্ডী রায়ও আদালতে শপথ করিয়া অনর্গল মিথ্যা বলিয়া গেল। চিন্ময়ী অবাক্ হইয়া সে সব শুনিল। তারপর সে কাঠগড়ায় উঠিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের মত আবোল তাবোল বকিয়া গেল, একটা মিথ্যাও চিন্ময়ী বজায় রাখিতে পারিল না।

মামলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বিচারকের রায় কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রহিল। ফিরিবার সময় চণ্ডী রায় ট্রেনের ইঞ্জিনের কাছে একটা কামরায় উঠিল, চিন্ময়ী উঠিল একেবারে পিছনে গার্ডের গাড়ীর ঠিক পরের কামরাখানায়।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন প্রাতঃকালে ডাক বিলির পরেই চণ্ডী রায়ের কালীবাড়ীতে ঢাক-ঢোল শানাই বাজিয়া উঠিল। সকলে শুনিল, চণ্ডী রায়

মামলায় জিতিয়াছে। গিরীশ সাহা দুইটা বোতল বগলে পুরিয়া রায়ের ওখানে ছুটিল।

রায় তখন কালীমন্দির পরিষ্কার করিতেছিল। মোকদ্দমার সময় হইতে রায়ের সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে মন্দির পরিষ্কার করা হয় নাই। সেই সব স্তূপীকৃত জঞ্জাল ঠেলিতে ঠেলিতে রায় আজ গান গাহিতেছিল—

ছিলাম গৃহবাসী—করিলি সন্ন্যাসী।

মধ্যাহ্ন তখন প্রায় অতীত হইতে চলিয়াছে, চণ্ডী রায় আজ এতদিন পরে পূর্ব্বের মত টলিতে টলিতে বাড়ীর বহির্দ্বারে আসিয়া ধাক্কা দিয়া ডাকিল, চেন্‌কা!

ধাক্কাতেই দরজাটা খুলিয়া গেল, খিল খোলাই ছিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রায় বলিল—সে কণ্ঠস্বরে কোন উষ্মা ছিল না—এই হারামজাদী চেন্‌কা, দেখ কার—

রায় কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না; কোথায় চেন্‌কা—ঘর-দুয়ার খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। রায় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, সেখানেও চেন্‌কা নাই, শুধু চেন্‌কা নয়, কাপড়-চোপড়, সেই টিনের বাক্সটি—চিন্ময়ীর কোন বস্তুরই চিহ্ন নাই। চিন্ময়ী কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

আবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া রায় দেখিল, তাহার যাহা কিছু সমস্তই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে।

সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মুক্তদ্বার শূন্য, সেই পিতৃপিতামহের আমলের পুরাণো ঘরখানা যেন কোন দন্তহীন জরতী যাদুকরীর মত কদর্য মুখগহ্বর মেলিয়া ব্যঙ্গহাস্যে তাহাকে উপহাস করিতেছিল।

রায়ের অসহ্য বোধ হইল, সে বহির্দ্বারের পথ ধরিল। কিন্তু কয়েক পদ আসিয়াই আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া সে খুঁজিতে লাগিল—কুলুপ চাবিটা কোথায় গেল?

চারহাটীর ষ্টেশনমাষ্টার

'ই-আই-আর'এর লুপ লাইনের একটা ষ্টেশন হইতে ছোট একটী লাইন বাহির হইয়া ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লুপের কাটোয়া ষ্টেশনে গিয়া শেষ হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে মাত্র মাইল চল্লিশেক, প্রস্থে দেড় হাত, গাড়ীগুলিও ছোট ছোট পায়রা খুপীর মত। এই জন্য দেশের লোকে বলে ছোট লাইন। চারহাটী ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার কিন্তু রাগিয়া লাল হইয়া উঠে। বলে, ছোট লাইন কি, ছোট লাইন কি? রেল লাইন ইজ রেল লাইন, তার আবার ছোট বড় কিহে বাপু? শালগ্রামের কি ছোট বড় আছে নাকি? বক্তা প্যাসেঞ্জার বলিল, আরে মশাই এই তো মোটে চল্লিশ মাইল লাইন, আর এই ছোট গাড়ী—

অসহিষ্ণু ষ্টেশনমাষ্টার বলিল, পঞ্চাশ মাইলের ভাড়া কেউ দেন? ছোট গাড়ী, কিন্তু কেউ কম জায়গা নিয়ে বসেন?

বক্তা বলিল, যা বাবাঃ, দোষটা কি হ'ল—

বাস্, বাস্! রেল লাইন ইজ রেল লাইন, ছোটও নাই বড়ও নাই, এরও লোহার লাইন ওরও লোহার লাইন, এ-ও ইঞ্জিনে টানে ও-ও ইঞ্জিনে টানে, এ-ও ধোঁয়া ছাড়ে ও-ও ধোঁয়া ছাড়ে, বাস্, এর আবার ছোট বড় কি?

হাঁস ফাঁস করিতে করিতে মাষ্টার ষ্টেশন ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বক্তা বলিল, লাইন ছোট হ'লে কি হবে, মাষ্টারটী জাঁদরেল, 'আকারোসদৃশ প্রাজ্ঞ'!

সহযাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। ষ্টেশনমাষ্টারের আকার অদ্ভুতই বটে। ভদ্রলোক যত মোটা, তত কাল, তাহার উপর মুখের চেহারাটা কেমন বোকা বোকা। সর্ব্বদাই ভুঁড়ি লইয়াই শশব্যস্ত! খালি গা, খালি পা; হাঁটু পর্য্যন্ত খাটো কাপড় পরিহিত মাষ্টারকে ষ্টেশনমাষ্টার বলিয়া চেনা দায়। কেহ সে কথা বলিলে মাষ্টার বলে, বাপ রে গরম তার ওপর ওই আলপাকার কোট সুঙসুঙনিতে ঘামাচি বেরিয়ে পড়ে গায়ে। আর চেনা বামুনের পৈতের দরকার কি? আমি বাবা আদি-পুরুষ, ভূষুণ্ডী কাক, ছিষ্টির আদি থেকেই আছি, আমাকে না চেনে কে হে বাপু!

কিন্তু অচেনা লোকও তো আসে কত?

তখন এই, বাস্ কপালে ছাপমারা বাবা—কালাটুপী—রাজমুকুট হয়ে গেল!

খালিগায়ে খালি পায়েই মাষ্টার টুপীটি মাথায় পরিয়া হাসিতে থাকে। হাসিতে হাসিতেই আবার বলে, মুকুটই হ'ল আসল জিনিস, পলাশীর যুদ্ধে সেরাজোদ্দৌলার মুকুট পড়ে গিয়েই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সেপাইরা আর নবাবকে দেখতেই পেলে না! আহা, অক্ষয় দত্ত, ইয়ে তর্কালঙ্কার সব কি বই-ই লিখে গিয়েছে! ইংরাজী বই তখন সব কি রকম ছিল—Twinkle—Twinkle little stars. তারপর, তোমার Little bird—Little bird come to me আহা দাঁড়াও, কি তারপরে—a cage ready for thee.

ওদিকে টেলিগ্রাফের কলটা টক্ টক্ শব্দে সাড়া দিয়া উঠিল। মাষ্টার তাড়াতাড়ি কলে হাত দিয়া আঙুলের টোকা মারিতে মারিতে হাঁকিল, যদুয়া, যদুয়া, আরে এ যাদ্দু! দেখ দেখি বেটা আবার গেল কোথায়? যদুয়া ষ্টেশনের জমাদার, পয়েণ্টম্যান, পিওন, আবার বাড়ী সাফাও করে, মাষ্টারের ঘরে জলও তোলে, মোটকথা মাষ্টার এখানকার কর্ত্তা হইলে যদুয়াকে বলিতে হয় গৃহিণী।

মাষ্টার প্লাটফর্ম্মে বাহির হইয়া আসিয়া আবার হাঁকিল, ওরে ও যদো!

যদোর পরিবর্ত্তে চারটী ছোট মেয়ে প্লাটফর্ম্মের ওদিক হইতে ছুটিয়া আসিল!

আমি ঘণ্টা দেব আজ!

আমি, আজ আমি, কাল তুমি দিয়েছ।

বাবা, আমি. আমি!

বছর আষ্টেক হইতে বছর পাঁচেক পর্য্যন্ত বয়স, মাথায় প্রত্যেকে পরস্পরের চেয়ে দুই আঙুল করিয়া ছোট, মিশমিশে কাল রঙ. যেন কুমোর বাড়ীর ছোট আকারের কালীমূর্ত্তিগুলি হঠাৎ জীবন্ত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

মাষ্টার বলিল, আচ্ছা সবাই এক ঘা ক'রে দে, এক ঘায়ের বেশী নয়।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েগুলি বুঝি মাষ্টারমশায়ের?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আরও তিনটী বাড়ীতে আছেন। এই ধরুন না, নান্তি, মান্তি, তারপরই হেলাফেলা করে নাম দিলাম পান্তি. যে, অরুচি ধরেছে আর এসো না, কিন্তু মানা কি শোনে মশাই। তারপর এলেন ক্ষান্তি, মানে ক্ষান্ত দাও মা সকল। তারপর হলেন শান্তি; তারপর আবার, তখন বুঝলাম সব

ভুল, নাম রাখলাম ভ্রান্তি। তারপর আবার, যখন হলেন তখন পড়লাম বিপদে, মিল দেখে আর নাম রাখা যায় না। আঙুল গুণতে গুণতে মনে পড়ে গেল ধারাপাত, কন্যা আমার সপ্তম—ধারাপাতেও দেখলাম, কাহন, চোক, পোণ, বুড়ি, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, কাজেই তার নাম রেখেছি ক্রান্তি! নান্তি, মান্তি, পান্তি, ক্ষান্তি, শান্তি, ভ্রান্তি, ক্রান্তি! দে দে, এইবার ঘণ্টা রেখে দে, আমাকে দে—ঢন্-ন-ন-ন-ন-করে দিই একবার। মাষ্টার হাতুড়ীটা লইয়া দ্রুতবেগে ঘন ঘন শব্দে একবার বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—টিকিট, টিকিট নাও সব।

ঘটা ঘট টিকিট কাটা হইতেছিল।

ওদিকে ষ্টেশনের বাহিরে একটা মোটর বাস ঘন ঘন হর্ণ দিতেছিল, একজন কেহ হাঁকিতেছিল, ছেড়ে যাচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে, একপয়সা করে ভাড়া কম। এস, এস কত্তা এস।

মাষ্টার ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, ষ্টেশনের সীমানার মধ্যেই মোটর-বাসের একটা লোক, এক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে! সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিছুদিন হইতে উহাদের অত্যাচারে প্যাসেঞ্জার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। গুজব উঠিয়াছে, এ ষ্টেশন নাকি উঠিয়া যাইবে। মাষ্টার ভুঁড়ি নাচাইতে নাচাইতে ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধের অপর হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

ট্রেনেই তোমাকে যেতে হবে, তুমি ষ্টেশনে এসে বসেছিলে কেন, পুঁটুলি রেখেছিলে কেন হে বাপু!

বাস্‌ওয়ালা বলিল, ছেড়ে দেন মাষ্টারমশায়, বাঃ ও যদি মটরেই যায়, ওর যদি তাই ইচ্ছে হয়!

নিকালো আমার সীমানাসে তুমি, আমার সীমানা থেকে তুমি প্যাসেঞ্জার ভাঙাতে এসেছ! আমার কোম্পানীর ক্ষতি করবে তুমি?

কোম্পানী তোমার বাবা হয়!

আলবৎ হয়। ছেড়ে দাও বলছি, নইলে পুলিশে রিপোর্ট করব আমি।

ও-দিকে সশব্দে ট্রেনখানা প্লাটফর্মের মধ্যে আসিয়া পড়িল। বাস-ওয়ালা বাধ্য হইয়া বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাষ্টার নিজেই তাহার বোঁচকা কাঁধে করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ষ্টেশনে হাজির করিয়া বলিল, পয়সা, পয়সা, জল্দি জল্দি! ট্রেনের ফার্ষ্টক্লাসে একজন

সাহেবী পোষাক পরিহিত বাঙালী ভদ্রলোক, জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিলেন, ষ্টেশনমাষ্টার!

ওদিকে গার্ড, ড্রাইভার উৎকণ্ঠিত ভাবে লাইন ক্লিয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। ষ্টেশনমাষ্টার তখন বৃদ্ধকে ঠেলিয়া গাড়ীতে তুলিতে ব্যস্ত।

ট্রেনের বিলম্ব হইতেছিল, এইবার গার্ড নামিয়া আসিয়া বলিল, মর তুমি, ইডিয়ট কোথাকার, শীগগির লাইন ক্লিয়ার দাও, গাড়ীতে নতুন সায়েব রয়েছে।

মাষ্টার ছুটিতে ছুটিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ট্রেনের সময় পিছাইয়া পড়িতেছিল। গাড়ী হইতে সায়েব হাঁকিতেছিলেন, ষ্টেশনমাষ্টার!

Yes sir!

ষ্টেশনমাষ্টার!

মাথায় টুপিটা পরিয়া জামাটা কাঁধে ফেলিয়া, কোমরে পেণ্টুলান টানিতে টানিতে মাষ্টার এবার বাহিরে আসিয়া ছুটিল। লাইনক্লিয়ারটা ড্রাইভারকে দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, অলরাইট!

গাড়ীর সিটী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া উঠিয়া ট্রেনখানাও চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়ীর পর গাড়ী মাষ্টারকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে—ফার্ষ্ট—সেকেণ্ডক্লাস বগি গাড়িখানা আসিতেই মাষ্টার আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল।

ষ্টেশনমাষ্টার!

মাষ্টার একেবারে চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, সায়েব পিছনে দাঁড়াইয়া, ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। সে এবার জামাটা গায়ে দিতে দিতে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, Yes sir!

সায়েব বলিলেন, তুমি নামতে আমাকে বাধ্য করলে! বারবার তোমায় আমি ডাকলাম, তুমি দেখা করলে না কেন?

মাষ্টার বলিল, An old man sir—

বুড়ো লোকের বোঁচকা তুলে দিচ্ছিলে, সে আমি দেখেছি। তারপরও তো দেখা করতে পারতে!

Lineclear sir. মাষ্টার তখনও তাহার জামার বোতাম লাগাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু জামাটা বহুদিনের পুরাতন, তখনকার উদরের পরিধি অপেক্ষা এখন মাষ্টারের উদর বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। একটা বোতাম

কোনরূপে লাগাইবা মাত্র সেটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল।

সে দৃশ্যে সায়েব ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, তারপর বলিলেন, চল তোমার খাতাপত্র দেখি!

সায়েব নোট লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা খাতার কাগজে ফুটিয়া বারবার কালি ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল, সায়েব বলিলেন, নতুন নিব দেখি একটা!

বলিয়া নিবটা খুলিয়া নিজেই ফেলিয়া দিলেন। মাষ্টার তাড়াতাড়ি একটা সিগারেটের খোল খুলিয়া সায়েবের সম্মুখে ধরিল, বাক্সটায় পরিপূর্ণ একবাক্স 'রেডইঙ্ক' নিব ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

সায়েব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এত নিব?

জমেছে sir, একটা নিবে আমার ছ' মাস যায়। বলিয়া সায়েবের ফেলিয়া দেওয়া নিবটা সে কুড়াইয়া সযত্নে কাগজে মুড়িয়া রাখিয়া দিল।

নোট লেখা শেষ করিয়া সায়েব বলিলেন, ষ্টেশনমাষ্টার!

Yes sir!

একটা দরখাস্ত আমার কাছে এসেছে যে তুমি নাকি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ঝগড়া কর?

মাষ্টার অবাক হইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল, ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে বলিল, আমাদের লাইনকে সব ঠাট্টা করে বলে ছোট লাইন, তাই—আমি বলি, ছোট বলবে কেন, ঝগড়া ত করি নে! সায়েব বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর আবার বলিলেন, মোটরবাসওয়ালাদের সঙ্গেই বা ঝগড়া কিসের তোমার?

কিছু না স্যর, তাদের সঙ্গে তো আমি দাবা খেলি। তবে প্যাসেঞ্জার ভাঙ্গিয়ে নিতে এলেই ঝগড়া করি। আজই ওই বুড়োকে আমি কেড়ে এনেছি।

তুমি ওদের টায়ারে পেরেক ফুটিয়ে দাও?

মাষ্টার মাথা চুলকাইয়া বলিল, সে ষান্দু দিয়েছিল, সে সময় ওরা বড় অত্যাচার করছিল স্যর। এক একদিন একটাও প্যাসেঞ্জার হ'ত না।

না, না, ওসব ক'র না ষ্টেশনমাষ্টার, ওগুলো ভাল নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টার জবাব দেয়, না স্যর, আর ক'রব না স্যর! তারপর অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সায়েব বলিলেন, তোমার কতদিন এ লাইনে কাজ হ'ল মাষ্টার?

From the very beginning sir, construction এর সময় থেকে এখানে আছি, এসব তখন ধু ধু করা ডাঙ্গা ছিল, রাত্রে নাকি হে'ড়োল মানে নেকড়ে বাঘ বেড়াত, এটার নামই হ'ল হে'ড়োল ডাঙ্গা!

হুঁ! সায়েব ছোট্ট একটা হুঁ বলিয়া নীরব হইলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা মাষ্টার, আবার শীগ্‌গির আমি আসব। আচ্ছা মাষ্টার, আমি শুনেছি, বাড়ীতে তোমার বিষয় সম্পত্তি ভালই আছে, না?

মাষ্টার বলিল, তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে, চকমিলান বাড়ী, আম-কাঁটালের বাগান—

সায়েবকে বিদায় করিয়া ষ্টেশনে তালা দিয়া মাষ্টার বাড়ীতে আসিবার হাঁক ডাক সুরু করিয়া দিল, নান্তি, মান্তি, পান্তি, সব গেলি কোথারে বাপু, গাঁয়ে যে আবার নেমন্তন্ন আছে!

মাষ্টারের স্ত্রী অল্প বয়সে এতগুলি সন্তান প্রসব করিয়া জীর্ণদেহ, তাহার উপর অসুখ লাগিয়াই আছে। ছোট তিনটীর অসুখ, একটীর জ্বর, একটীর পেটের অসুখ, একটীর ফোঁড়া হইয়াছে। মাষ্টার নিজেই বাকী মেয়ে কয়টীকে ধুইয়া মুছিয়া বলিল, নে, সব একটা ক'রে গেলাস নে, সন্দেশ তরকারী নিয়ে আ'সবি, কাল খাবি সব।

সারিবন্দী মাষ্টারের কালি-বাহিনী বাহির হইল। বহুদিন এইখানে মাষ্টার আছে, ফলে মাষ্টার গ্রামেরই একঘর হইয়া গিয়াছে, কোন নিমন্ত্রণেই তাহার ঘর বাদ পড়ে না; মাষ্টারও তাহার কন্যা-বাহিনী লইয়া গিয়া সারি দিয়া বসে। শুধু খাইয়া থাকে না মাষ্টার, গ্রামের লোককে খাওয়ায় সে। বৎসরে দুইবার বাৎসরিক পিতৃ ও মাতৃশ্রাদ্ধে গ্রামের লোককে খাওয়ান তাহার চাই-ই।

বলে, হা-ঘ'রে তো নই মশায়, তবে চাকরীর দায়ে হা-ঘ'রে হয়ে আছি—এই ডাঙ্গায় পড়ে আছি। নইলে দেশে বাড়ীতে এখনও দোল, দুর্গোৎসব—পাল পার্ব্বণে খাওয়ান দাওয়ান লেগেই আছে।

আবার আম দিতে দিতে বলে, একি আম মশাই, আমড়া—আমড়া! খাওয়াতে পারতাম আমাদের দেশের বাগানের আম, একেবারে খাস-আম! হতভাগা চাকরীর নেশাতেই আমাকে খেলে, দাদা যে বলেন, আচ্ছা তোর চাকরীতে কাজ কি? আমি বলি, দাদা, রেলগাড়ীর বাঁশী না শুনলে আমার ঘুম হয় না।

আজ বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ীতে মাষ্টার সারি দিয়া বসিয়া গিয়াছে। ভাত পাড়িতেছিল, মান্তি বলিল, আর দিয়ো না।

মাষ্টার বলিল, নে, নে গরম ভাত, এই সময়ে নে। হারামজাদী খাবে এক কাঁড়ি, আর গোড়া থেকেই বলবে, আর না, আর না। বলিয়া নিজেই চাপিয়া চাপিয়া ভাত সাজাইয়া দিতে লাগিল। পরিবেশনকারী বলিল, এ তিনখানা পাতা কার?

মাষ্টার বলিল, আমারই আর তিন মেয়ের, তাদের আসতে দেরী হবে!

এই যে মাষ্টারমশায় এসেছেন, নমস্কার! একটি ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিল। মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছিষ্ট হাতই কপালে ঠেকাইয়া কহিল নমস্কার, নমস্কার, কেমন আছেন?

ভাল। তারপর আপনার খবর কি? শুনেছি নাকি ষ্টেশন উঠে যাচ্ছে?

যাক্ গে মশাই, ও গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি, চলে যাব দেশে। হতভাগা চাকরী যে ছাড়লে বাঁচি, দেশে গিয়ে আরাম ক'রে বাঁচি। পাকা চক-মিলেন দালান বাড়ী, আম-কাঁঠালের বাগান। কিন্তু কোম্পানী কি আমাকে ছাড়বে, এই আজই সায়েব এসেছিলেন, কাজ দেখে ভয়ানক খুসী, বলেন, আমি জানি তুমি সেই গোড়া থেকে আছ, তোমাকে নইলে চলবে না।

আচ্ছা, বাসওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া না কি হয়েছে শুনলাম!

হবে না কেন মশাই, আস্পর্দ্ধা দেখুন দেখি, ষ্টেশন কম্পাউণ্ড থেকে প্যাসেঞ্জার উঠিয়ে নিয়ে যাবে! এবার পুলিশে দেব আমি!

অন্তরাল হইতে কে বলিল, হ্যাঁঃ, কোম্পানী যেন ওর বাবা হয়, কোম্পানী, কোম্পানী করেই ম'ল।

কথাটা মাষ্টারের কানে গিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, হাণ্ড্রেড টাইম্‌স্, থাউজেণ্ড টাইম্‌স্, কোম্পানী আমার বাবা। অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, বলায় যে, পঞ্চ-পিতার মধ্যে জন্মদাতা পিতা ছাড়া—

সম্মুখের ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিল, যস্য কন্যা বিবাহিতাটাও বাদ দেবেন মাষ্টারমশায়!

মাষ্টার এবার হাসিয়া বলিল, তা বটে, মনে ছিল না। কিন্তু তাই বা বাদ দেব কেন মশাই, আমার শ্বশুরও ছিলেন এই কোম্পানীর চাকর, তাঁরই দৌলতে আমার চাকরী। নইলে দেখছেন তো আমার এই কড়া-ক্রান্তির দল, সব ভাগাড়ে ফেলতে হ'ত অন্নাভাবে।

অন্তরালবর্ত্তী ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, কেন, দেশে চক-মিলেন বাড়ী—আম-কাঁটালের বাগান।

মাষ্টার বলিয়া উঠিল, বাপু হে, তোমাদের মত বাপের অন্ন ধ্বংস করতে ভালবাসি না আমরা। আমরা খেটে খেতে চাই, বুঝলে!

বলিয়া 'সড়াম' করিয়া খানিকটা মুগের ডাল টানিয়া লইয়া বলিল, বাঃ বেড়ে রেঁধেছে তো ডালটা--ওহে, দেখি আর একটু ডাল! এই গেলাসে, গেলাসে একটু দিয়ে যাও বাবা। হ্যাঁ, ভাল লোক তুমি।

আহার সারিয়া উচ্ছিষ্ট পরিপূর্ণ গ্লাস কয়টী মেয়েদের হাতে দিয়া—নিজে সেই পাতা তিনটী গামছায় বাঁধিয়া লইয়া মাষ্টার মন্থর গমনে ফিরিতেছিল। ষ্টেশনের ধারে চায়ের দোকানের সম্মুখে মোটর বাস্‌টা দাঁড়াইয়া আছে। মাষ্টার হাঁকিয়া বলিল, ফুলু রয়েছ নাকি, পাত হে ছক গুটী পাত, আমি আসছি।

সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে দাবার আসর বসে, মাষ্টার বাসওয়ালাদের সংগে দাবা খেলে। কোন বিরোধ নাই, মধ্যে মধ্যে রসিকতায়, রহস্যে, উচ্চহাস্যে আসর যেন ফাটিয়া পড়ে।

সেদিন থাকিতে থাকিতে ফুলু বলিল, আচ্ছা মাষ্টারমশাই, প্যাসেঞ্জার নিয়ে ঝগড়া করেন কেন বলুন ত? আপনার তো মাইনে কাটে না কোম্পানী!

মাষ্টার বলিল, উটী ব'ল না ভাই! কোম্পানী আমার অন্নদাতা, তার লোকসান আমি হ'তে দিতে পারব না।

ফুলু বেশ ভাল রকমের একটা কিস্তি পাইয়াছিল, সে বাসের কথা ভুলিয়া সজোরে একটা বোড়ে টিপিয়া ধরিয়া বলিল কিস্তি! চুলোয় যাক প্যাসেঞ্জার এখন কিস্তি সামলান।

মাষ্টার দেখিয়া শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, হারলাম ভাই আমি।

বলিয়া সটান আসরেই শুইয়া পড়িয়া বলিল, উঃ পেটটা চড় চড় করছে!

দিন পনের পর। সেদিন আবার সায়েবের 'সেলুন' আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সায়েব নামিতেই মাষ্টার সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সেদিন পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া কোট্ পান্টুলান টুপী পরিয়া সুসজ্জিত হইয়া মাষ্টার অপেক্ষা করিতেছিল। ঘর দুয়ার সমস্ত পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে, কাঠের চেয়ারের উপর একটা ছোটছেলের বালিশ দিয়া গদি করা হইয়াছে।

সায়েব আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার আড়ম্বর দেখিয়াও আজ কিছু বলিলেন না, অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া অবশেষে বলিলেন, ষ্টেশনমাষ্টার!

Yes sir!

আমি বড় দুঃখিত, একটা দুঃসংবাদ তোমায় দিতে হবে।

মাষ্টার হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সায়েব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি জান বোধ হয়, এ ষ্টেশন এবং আরও কয়েকটা ষ্টেশন রেখে কোম্পানীকে লোকসান দিতে হচ্ছে। তাই কোম্পানী স্থির করেছেন এ ষ্টেশনগুলো উঠিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাগ ষ্টেশন ক'রে দেবেন। কোনও ষ্টাফও থাকবে না, সিগন্যালও না, তবে গাড়ী থামবে, প্যাসেঞ্জার-দের ট্রেনেই চেকাররা টিকিট দেবে, তারাই এখানে টিকিট কলেক্শন করবে!

আমি কোথায়—? মাষ্টার কথা শেষ করিতে পারিল না।

এ সমস্ত ষ্টেশনের ষ্টাফও কোম্পানী রিডাকশন করছেন।

মাষ্টার বিস্ফারিত নেত্রে সায়েবের দিকে চাহিয়া রহিল।

সায়েব বলিলেন, তোমার তো বেশ ভাল সংস্থান আছে মাষ্টার। তুমি প্রভিডেন্ট ফান্ড—বোনাসের টাকা নিয়ে দেশেই ভাল ক'রে চাষ-বাস, কিম্বা ব্যবসা কর গিয়ে, তোমার ভাল হবে।

মাষ্টার বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সমস্ত মিথ্যে কথা স্যর!

সায়েব সবিস্ময়ে বলিলেন, কি মিথ্যে কথা?

আমার কিছুই নাই, দেশে ঘর-বাড়ী পর্য্যন্ত নাই। সব আমি মিছে ক'রে ব'লতাম!

সায়েব বলিলেন, ইস্, করেছ কি মাষ্টার, সেদিনও যে তোমায় আমি জিজ্ঞাসা ক'রে গেলাম! তোমার সংস্থান আছে জেনে আমি তোমার নাম রিডাকশন লিষ্টে দিলাম।

মাষ্টারের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পাড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ পর সায়েব বলিলেন, বল তো মাষ্টার, কি করতে পারি আমি? আচ্ছা, এক কাজ কর তুমি, কোন ব্যবসা কর, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস্ ছাড়া আমি তোমায় পাঁচ শ' টাকা দেব। বল তুমি কি করবে?

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া মাষ্টার বলিল, এখানেই স্যর, একটা কয়লার ডিপো—কোন ডিপো এখানে নাই।

অলরাইট, তাই কর তুমি, রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তুমি বিনা খাজনায় জায়গা পাবে।

আর স্যর, ঐ কোয়াটারে—

সেও থাকতে পার তুমি, কোয়াটার্স ত খালিই পড়ে থাকবে।

এবার মাষ্টার জোড়হাত করিয়া বলিল, স্যর, আপনাদের টিকিট তো চেকারে নেবে, যদি দয়া ক'রে আমাকে নিতে দেন—

সায়েব বলিলেন, সে তো হবে না মাষ্টার, কোন লোক তো ওজন্যে আমরা রাখব না।

মাষ্টার বলিল, মাইনে আমি চাই নে স্যর।

সবিস্ময়ে সায়েব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাষ্টার বলিল, স্যর, লোকে বলবে কোম্পানী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে—

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল। সায়েব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু প্রাইভেট অ্যারেঞ্জমেণ্ট মাষ্টার।

আশ্চর্য্য মানুষ! সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টারের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, একটু চা খেতে হবে স্যর। আমার স্ত্রী খুব ভাল চা করে স্যর। আমার শ্বশুর ডুয়ার্সে থাকতেন, দিনে আঠার বার ক'রে চা খেতেন। বস্তায় ক'রে তাঁর চা চিনি থাকত।

মাষ্টার এখন ডিপোয় কয়লা বেচে। বলে, ঝাড়ু মারি চাকরীর মুখে! বলে কিনা, পাঞ্জাবে আমাদের একটা লাইন আছে, সেখানে যেতে আমায়! তার চেয়ে ব্যবসা ভাল, স্বাধীন। ট্রেনের সময় হইলেই ছুটিয়া গিয়া তেমনি ভুঁড়ি দোলাইয়া হাঁকে, টিকিট্, ও মশাই টিকিটটা দিয়ে যান।

পরিচিত লোককে হাসিয়া বলে, দেখুন না কর্ম্মভোগ, পুরানো-মুনিব কোম্পানী, বলে, গাঙ্গুলি, তুমি চাকরী ছেড়ে যখন ওখানেই আছ তখন দেখে শুনে একটু দিয়ো। ওহে মিয়াসাহেব, বেশ আড়ে আড়ে চল্‌ছ যে, টিকিট, টিকিট দিয়ে যাও, টিকিট!

সংসার

বৃদ্ধ বয়সে দাম্পত্য কলহ কৌতুক এবং হাসির কথা। কিন্তু প্রেমের দেবতা চিরদিনই অবুঝ কিশোর, স্থান-কাল-পাত্র লইয়া কোন বিবেচনা বা বিচার করা তাহার প্রকৃতির বহির্ভূত। পঞ্চান্ন বৎসরের সরকার গৃহিণী ষাট বৎসরের বৃদ্ধ স্বামীর উপর দুর্জ্জয় অভিমান করিয়া বসিলেন গোপনে নয়, একেবারে প্রকাশ্যে, উপযুক্ত ছেলে-বউ এবং একঘর নাতি-নাতনীর সমক্ষেই অভিমান ঘোষণা করিয়া গাড়ী আনাইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ছেলে-বউয়েরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। বড় নাতনী সদ্য-বিবাহিতা কমলা কিন্তু থাকিতে পারিল না, সে মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরকার-গিন্নী গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাসছিস যে বড়?

কমলা হাসিতে হাসিতেই বলিল, একটা ছড়া মনে পড়ল ঠাকুমা।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গিন্নী বলিলেন, ছড়া?

হ্যাঁ। শিবদুর্গার সেই ছড়া, সেই যে—

"মর মর মর ভাঙড় বুড়ো তোর চক্ষে পড়ুক ছানি
বাপের বাড়ী চললুম আমি—বলেন দুর্গা রাণী—
কোলে লয়ে কার্ত্তিক, হাঁটায়ে গণপতি—
রাগ ক'রে চলিলেন অম্বিকে পার্ব্বতী।"

তা বাবাকে কাকাকে নিয়ে যাও!

নাতনীর এ-রহস্য সহাস্যমুখে তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বুকে বরং আঘাতই লাগিল। রহস্যের উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দিতে পারিলেন না, শুধু কমলার মুখের দিকেই নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সে-দৃষ্টির ভাষাতেই কমলা নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া একান্ত অনুতপ্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠেই বলিল, রাগ করলে ঠাকুমা?

ম্লান হাসি হাসিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া গিন্নী বলিলেন, তোর ওপর কি রাগ করতে পারি ভাই?

কমলি আবার রসিকতা করিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল, বর অদল-বদল কর ঠাকুমা. আমার সে ভারী অনুগত বর। তুমি খুশী হবে। আমি একবার বুড়োকে দেখি তা হ'লে!

এবার ঠাকুমা হাসিয়া ফেলিলেন. তারপর বলিলেন, তার চেয়ে তুই দুটোই নে ভাই। আমার আর চাই না. আমার অরুচি ধরেছে।

কমলি বলিল, কিন্তু তুমি এমন ক'রে বাপের বাড়ী যেয়ো না ঠাকুমা, লোকে হাসবে।

ঠাকুমা এবার জ্বলিয়া উঠিলেন—তবে তো আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে লো হারামজাদী! কেন আমি আমার বাপের বাড়ী যেতে পাব না, ভাই-ভাজ কি সংসারে পর না কি? আয় রে খেঁদী, আয়। বলিয়া ছোট নাতনী খেঁদীর হাত ধরিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ছোট ছেলে অমৃত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল, বেশী দিন থেকো না মা, দিন দশেকের মধ্যেই চলে এস!

গিন্নী বলিলেন, আমি আর আসব না বাবা। তোমার বাপের ও হতচ্ছেদার ভাত আমি খেতে পারব না!

নাতনী খেঁদীও বলিয়া উঠিল, আমিও বাবা, আমিও আর আসব না।

তাহার কথা শেষ না হইতেই শিহরিয়া উঠিয়া গিন্নী তাহার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিলেন—কি, কি বল্‌লি হারামজাদী! কি বল্‌লি?

খেঁদী অপ্রত্যাশিতভাবে চড় খাইয়া হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ঠাকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ক্রুদ্ধ বিড়ালীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তুই বললি কেন, তুই?

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া গিন্নী বলিলেন, বল্‌ শীগ্‌গির আসব বাবা! বল্‌।

অমৃত হাসিতে হাসিতেই সেখান হইতে ফিরিল। বলিল, ঐ হয়েছে মা, তুমি বললেই ও এখুনি বলবে।

কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিরোধ। কর্ত্তা সংকল্প করিয়াছিলেন, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাইবেন। কথাটা মনে মনেই রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করিলেন যাত্রার

পূর্ব্বদিন। শুনিবামাত্র গিন্নী নিজের মোটঘাট বাঁধিতে বসিলেন, কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি? তুমি কোথা যাবে?

একটা কৌটায় দোক্তাপাতা পুরিয়া পোঁটলায় বাঁধিতে বাঁধিতে গিন্নী বলিলেন, আমিও যাব। সঙ্গে সঙ্গে মেলার পিতল কাঁসা ও পাথরের বাসনের দোকানগুলি সারি সারি কর্ত্তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বাসা আর দোকান, দোকান আর বাসা! অন্তত কুড়ি-পঁচিশ টাকা। কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন, উঁহু!

উঁহু কি? তোমার হুকুমে নাকি?

তুমি তো এই কার্ত্তিক মাসে গাঙ্গাস্নান করে এলে!

কার্ত্তিক মাসে করেছি তো পোষ মাসে কি? আমি যা—বোই। তুমি সঙ্গে করে আমাকে কোথাও নিয়ে যাও না। ছেলেদের সঙ্গে দাও, আর তারা গিয়েই ধুয়ো ধরবে, টাকা নেই, বাবা বকবে! ও-সব হবে না। এবার আমি ওই চাটুজ্জেদের মত একখানা বড় গামলা আর বাঁড়ুজ্জেদের মত একটা ডেকচি কিনব।

কর্ত্তা আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন, তার চেয়ে বল না যে আমাকে অন্তর্জ্জলী করে দিতে যাবে!

মুহূর্ত্তে গিন্নীর সর্ব্ব অবয়ব যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল, গ্রন্থিবন্ধন-নিরত হাত দুইখানি পোঁটলার উপর আড়ষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল, মুখের চেহারায় নিমেষে সে এক অদ্ভুত রূপান্তর।

কর্ত্তা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, চট্ করিয়া সংশোধনের একটা উপায় ঠাওরাইয়া তিনি হাহা করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইলেন, নিতান্ত প্রাণহীন কাষ্ঠহাসি! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সে পারব না বাপু, এই বুড়ো বয়সে আমি তোমাকে অন্তর্জ্জলী করতে পারব না!

তার পর আবার খানিকটা সেই হাসি, হে-হে-হে-হে!

গিন্নী কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাটির মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িলেন। কর্ত্তা পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন, তাই চল; গাঁটছড়া বেঁধে গঙ্গাস্নান করতে হবে কিন্তু! তখন কিন্তু লজ্জা করলে শুনব না! কত বাসনই কেনো তাই আমি একবার দেখব!

তবুও কোন উত্তর নাই। কর্ত্তার বুকের ভিতরটা একটা দারুণ অস্বস্তির উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, পা দুইটা যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল

হইয়া আসিতেছে।—যাই দেখি, তাহ'লে দু'খানা গাড়ীই সাজাতে বলি। একখানা গাড়ীতে জিনিসপত্র আসবে। বড় গামলা—ও দু'খানা কেনাই ভাল, একখানাতে ডাল একখানাতে ঝোল! তা বটে, বাসন কতকগুলো সত্যিই দরকার! হ্যাঁ, বলিতে বলিতেই তিনি পলাইয়া আসিলেন। খানিকটা পাড়ার চাটুজ্জের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গিন্নী পণ করিয়াছেন, এ-বাড়ীর অন্ন আর তিনি গ্রহণ করিবেন না, বাপের বাড়ী যাইবেন। এ-বাড়ীতে থাকিবার দিন তাঁহার নাকি শেষ হইয়াছে।

দাম্পত্য প্রেমে মানুষকে যেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন করে এমন আর কিছুতে পারে না। সরকার-কর্ত্তা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, গ্রামের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি, সেই কর্ত্তা দাম্পত্য কলহে দিশা হারাইয়া সেই রাত্রে শয়নকক্ষে মুখ ঢাকিয়া একখানা গামছা বাঁধিয়া বসিয়া রহিলেন; মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, গিন্নী দেখিয়া নাক বাঁকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি গান ধরিয়া দিবেন, এ পোড়ারমুখ হেরবে না ব'লে হে, আমি বিদেশিনী সেজেছি!

হঠাৎ পৌত্রী কমলা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল. তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া সে একটু চকিত হইয়াই বলিল, ও মা গো, ও কি?

কর্ত্তা আজ যেন একেবারে ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছেন, কমলার এই আতঙ্ক দেখিয়া কৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমি ভূত!

কমলি সেয়ানা মেয়ে, সে ব্যাপারটা সঠিক না বুঝিলেও আভাসে খানিকটা অনুমান করিয়া লইল; সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তা ভূতমশায় আপনি খিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনার পেত্নী আসবেন না, আমার কাছে শুয়েছেন।

কর্ত্তা মুখের গামছাখানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিশাহারার মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনের মধ্যেও দারুণ অস্বস্তি, বুকের ভিতরটা এক অসহনীয় উদ্বেগে অহরহ পীড়িত হইতেছে। সহসা তাঁহার ইচ্ছা হইল, নিজের গালেই তিনি ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া দেন। তার পর রাগ হইল গিন্নীর উপর। কি এমন তিনি বলিয়াছেন যে কাঁচখুকীর মত এমনধারা রাগ করিয়া বসিল বুড়ী! তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, নির্জ্জন ঘরের সুবিধা পাইয়াই বোধ হয় অকস্মাৎ গিন্নীর উদ্দেশে দুই হাত

নাড়িয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিলেন, এ্যাঁই, এ্যাঁই! এ্যাঁই! এ্যাঁঃ, কচি খুকী আমার! গলায় দড়ি দিক গে একগাছা, লজ্জাও নেই! এ্যাঁঃ!

পরদিনই গিন্নী বাপের বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন; ছেলে-বউ নাতি-নাতনী কাহারও কথা শুনিলেন না। কেবল ছোটছেলের মেয়ে খেঁদী কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িল না গিন্নীও তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারেন না, সে-ই সঙ্গে গেল।

বহির্ব্বাটীতে কর্ত্তা তখন বাড়ীর কৃষাণদের সঙ্গে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছেন। রাগে তিনি যেন আগুনের মত জ্বলিতেছিলেন।

দিন পাঁচেক পরেই বৃদ্ধ সরকার-কর্ত্তা শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে গাড়ীতে এক-গাড়ী বোঝাই-করা বাসন।

গিন্নী চলিয়া যাওয়ার পর তিনিও রাগ করিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং আর তিনি ফিরিবেনই না, গঙ্গাতীরেই একখানা কুটীর বাঁধিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিবেন। পরদিনই তিনি গঙ্গাস্নানে রওনা হইলেন, সঙ্গে গোপনে টাকাও লইলেন অনেকগুলি। একখানা বাড়ী, ছোটখাটো যেমনই হউক, কিনিয়া তিনি ফেলিবেনই! কিন্তু সেখানে গিয়া বাড়ীর পরিবর্ত্তে এক গাড়ী বাসন কিনিয়া তিনি স্বগৃহের পরিবর্ত্তে শ্বশুরগৃহে আসিয়া উঠিলেন। শ্যালকেরা পরম আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পা-হাত ধুইবার জল, তামাক, জেলে ডাকিবার বন্দোবস্ত, সে অনেক কিছু। হুঁকাতে কয়েকটা নামমাত্র টান দিয়াই সরকার-কর্ত্তা উঠিয়া বলিলেন, চল তোমাদের গিন্নীদের একবার দেখে আসি। শ্বশুরবাড়ীর আনন্দই হ'ল শালী আর শালাজ। চল। বলিয়া নিজেই তিনি অন্দরের পথ ধরিলেন।

একখানা কার্পেটের আসনে মহা সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া বড় শ্যালক-পত্নী প্রণাম করিয়া উঠিয়াই ফিক্ করিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, তার পর? এলেন?

কর্ত্তাও ঐ হাসিই একটু হাসিয়া বলিলেন, এলাম।

হুঁ। বলিয়া শ্যালক পত্নী আবার হাসিলেন।

মাথা চুলকাইয়া কর্ত্তা বলিলেন, খেঁদী কই?

পাখী উড়েছে. দিদি এখানে নেই সরকারমশাই!

তোমার দিদির কথা আমি জানতে তো চাই নি. খেঁদী কই?

ঐ হ'ল গো। দিদি তাকে নিয়ে বুড়ো বয়সে গেলেন মামার বাড়ী! এই কাল গিয়েছেন।

মামার বাড়ী? সরকার-কর্ত্তার সর্ব্বাঙ্গ এই মাঘের শীতে যেন জল-সিঞ্চিত হইয়া গেল। শ্যালক-পত্নী বৃদ্ধ বয়সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তার পর ডাকিলেন, ওগো ও দিদি, নেমে এস না ভাই, কর্ত্তার বুকে যে তোমার খিল ধরে গেল গো!

সরকার-গিন্নী সত্যই নামিয়া আসিলেন, কিন্তু কর্ত্তাকে একটি কথাও না বলিয়া ভাজকে বলিলেন, তোমার কি কোন আক্কেল নেই বউ? ছি উপযুক্ত ছেলে-বউ কি সব ভাবছে বল তো?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই খেঁদী একেবারে লাফ দিতে দিতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল—ওরে বাবা রে! দাদু এক গাড়ী বাসন এনেছে। এই বড় বড় গামলা, এত বড় ডেকচি, গেলাস, বাটি, কত—কত। সে দাদুর গলা জড়াইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িল।

শ্যালক-পত্নী বলিলেন, সব তোমার ঠাকুরমায়ের! তোমার জন্যে খট খট লবডঙ্কা!

খেঁদী এবার পিঠ হইতে কোলে আসিয়া বসিয়া বলিল, এ্যাঁ, আমার জন্যে কি এনেছ, এ্যাঁ!

সরকার-কর্ত্তা গিন্নীর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরে গান করিয়া বলিলেন, তোমার জন্যে একখানি নয়না এনেছি হে! আর একখানি কিরুণী এনেছি! বলিয়া পকেট হইতে ছোট্ট একখানি আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া দিলেন।

খেঁদী বলিল, যাঃ এ যে আয়না চিরুণী নয়না কিরুণী কেন হবে?

ইয়া বড় বড় হলেই বুঝি আয়না চিরুণী, আর এ হ'ল নয়না আর কিরুণী।

আর আর! না এ ছাই! এ আমি নেব না। ঠাকুরমায়ের জন্যে কত এনেছ তুমি, হ্যাঁ।

এবার ঠাকুরমা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এনেছে এনেছে, তোর জন্যে অনেক এনেছে। একটু থাম্, মানুষকে একটু জিরুতে দে!

কর্ত্তা পুলকিত হইয়া বলিলেন, বাক্সটা নামিয়ে আনতে বল। কথা শেষ না-হইতেই খেঁদী ছুটিল—বাক্স বাক্স!

কর্ত্তা আবার বলিলেন, বাসনগুলো নামাতে বল; গামলা কিনেছি চারখানা, ডেকচি বড় বড় দুটো—

বাধা দিয়া গিন্নী বলিলেন, নামিয়ে আর কি হবে, বাড়ীতেই নামাবে একেবারে। খাওয়া-দাওয়া ক'রেই চলে যাও।

বলিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। অকূল সমুদ্রে কর্ত্তার হাত হইতে যেন অকস্মাৎলব্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি আবার ভাসিয়া গেল। শ্যালক-পত্নী হাসিয়া বলিলেন, কঠিন ব্যাপার সরকারমশাই!

সরকার কাতর স্বরেই বলিলেন, কি করি বল দেখি ভাই?

উপর হইতে প্রশ্ন হইল. বলি, নন্দাইকে জলটল খেতে দাও, না আমোদই করবে?

ও-মা! বলিয়া জিব কাটিয়া শ্যালক-পত্নী ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন, বৌমা, বৌমা, কি আক্কেল তোমাদের বাপু, ছি!

বৌমার অপরাধ ছিল না, সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল. জলখাবারের থালা হাতে সে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

তখনকার মত চাপা পড়িলেও শেষ পর্য্যন্ত শ্যালক-পত্নীই মধ্যস্থ হইয়া স্বামী-স্ত্রীর একটা আপোষ করিয়া দিলেন। সরকার-মহাশয়কে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন, দেখুন, কথার খেলাপ করবেন না তো? তিন সত্যি করুন আপনি।

তিন সত্যিই করছি গো আমি। আনব আনব—এক বছরের মধ্যেই আমি হরিদ্বার পর্য্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনব।

সরকার-গিন্নী বলিলেন, যে-কথা তুমি বলেছ আমাকে, তার জন্য আমাকে একশো আটটি সধবা ভোজন করাতে হবে এক মাসের মধ্যে।

বেশ তাই হবে। নতুন বাসনে একটা কাজ হয়ে যাক।

শ্যালক-পত্নী বিনা-বাক্যব্যয়ে এবার হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িলেন। সরকার-গিন্নী বলিলেন, তুমি সাক্ষী থাক ভাই বউ, কই বউ—

হাসিয়া সরকার বলিলেন, চলে গিয়েছেন তিনি।

বাহির পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়া সরকার-গিন্নী বলিলেন, বলি, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি? রাজ্যের বাসন নিয়ে যে একবারে এখানে চলে এলে? এখানে সমস্ত ছেলের হাতে আমাকে একটি করে বাটি নয় গেলাস দিতে হবে। ষেটের কোলে পনর-ষোলটি ছেলে! কোন আক্কেল নেই তোমার।

সরকার বলিলেন, বেশ তো গো, আবার তোমাকে কিনে দিলেই তো হ'ল?

পরদিনই সরকার-মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় গিন্নী আবার বলিলেন, দেখ, এক বছরের মধ্যে তুমি নিজে সঙ্গে ক'রে হরিদ্বার পর্য্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনবে তো?

আবার সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আনব, আনব, আনব।

কিন্তু আপত্তি তুলিল ছেলেরা। প্রবল আপত্তি করিয়া বড় ছেলে বলিল, বেশ তো যাবেন আর কয়েক বছর পরে। আমরা সব বুঝে সুঝে নিই।

সরকার-কর্ত্তা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শোন, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের উপযুক্ত ছেলের কথা শোন একবার।

তার পর ছেলেকেই বলিলেন, এই দেখ, আমার তখন পঁচিশ বছর বয়স। পঁচিশ নয়—পুরো চব্বিশ—নামে পঁচিশ, সেই বয়সে আমি বাপ-মাকে কাশীবাস করিয়েছিলাম। দেখলাম বাবার শরীর খারাপ, চিঠি লিখে কাশীতে বাড়ীভাড়া করলাম। বাবা কিছুতেই যাবেন না, আমি জোর ক'রে নিয়ে গেলাম। ভাল স্থান, ভাল খাবেন, ভাল থাকবেন, বিশ্বনাথ দর্শন করবেন! কোথায় এ সংসারপঙ্কে ডুবে এই গোষ্পদে পড়ে থাকবেন! শেষ সময়ে বাবা দু'হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। আর তোরা এই বলছিস? তাও আমরা চিরদিনের মত যাই নি, এই মাস-দুয়েক পরেই ফিরব!

ছেলে বলিল, ব্যবসার বাজার যা মন্দা পড়েছে তাতে ঝক্কি ঘাড়ে নিতে আমার সাহস হচ্ছে না। তার উপর চাষ, জমিদারী, হাইকোর্টে মোকদ্দমা, এ সামলাতে আমরা পারব না।

এবার বিরক্ত হইয়া সরকার-কর্ত্তা বলিলেন, না পারলে হবে কেন? আমরা কি চিরজীবী? আমি এই সংসারের ভার নিয়েছি পঁচিশ বছর বয়সে। তখন

ছিল কি? বাবার পৈত্রিক পাঁচ-শ' টাকা জমিদারীর আয় আর শ'-খানেক বিঘে জমি। বাবা কাশী যাবার পর ব্যবসা আরম্ভ ক'রে এই সব আমি করেছি। বাবা কিছুতেই ব্যবসা করতে দেবেন না, আমিও ছাড়ব না। তাঁকে কাশীতে রেখে এসেই আমি ব্যবসা করেছিলাম। তোদের মত ভয় করলে হ'ত এই সব? না, বাপের আঁচল ধরে বসে থাকলে হ'ত?

ছেলে এবার বাধ্য হইয়া বলিল, তবে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার সে বলিয়া উঠিল, কিন্তু—

আবার কিন্তু তুলিস কেন! কিন্তু কিসের?

টাকাকড়ির বড় টানাটানি চলছে, কোথা থেকে যে টাকা আপনাদের দেব তাই ভাবছি। মাস তিনেক পরে—

বাধা দিয়া সরকার-কর্ত্তা বলিলেন, টাকাকড়ি কিছু লাগবে না বাবা, তোমাদের টাকা আমি নেব না, তীর্থের টাকা, সে আমার কাছে আছে।

হাসিয়া ছেলে বলিল, আমাদের টাকা? বিষয় সম্পত্তি সংসার আমাদের না আপনার?

এবার সরকার-গিন্নী বলিলেন, সংসার তোমাদের বই কি বাবা, ছেলেমেয়ে ঘরদোর সবই এখন তোমাদের। আমরাও এখন তোমাদের ছেলেমেয়ের সামিল।

কর্ত্তা বরং বলিলেন, না না, তা বললে হবে কেন? যত দিন আমরা আছি তত দিন ঝড়ঝাপ্টা আমাদেরই মাথায় নিতে হবে বই কি। বাপমায়ের আড়াল হ'ল পাহাড়ের আড়াল!

যাক্। ইহার পর আর কোন বাধাই হইল না, উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া সরকার-কর্ত্তা শুভদিনে গৃহিণীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ট্রেনে উঠিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। ছেলেরা, ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কেমন বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘর-দ্বার দেখা যায় না কিন্তু গ্রামপ্রান্তের গাছপালাগুলির শ্যামলতার উপরেও কেমন যেন উদাসীনতার ছাপ পড়িয়াছে।

সরকার-গিন্নী জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বোধ করি সকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, এই তো ক'টা দিন, দু'মাসে ষাট দিন।

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, খুব হুঁসিয়ার বাবা। যে কাজ করবে বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে, বরং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি লিখে দেবে। আমি যেখানে যাব ঠিক-ঠিকানা আগে থেকে জানাব।

ট্রেনটা ইতিমধ্যেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না মা, এমন ক'রে ট্রেনের সঙ্গে—

ট্রেন গতি সঞ্চয় করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল, একটা কথা, জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না ছাই।

কনিষ্ঠ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—কি?

এই কোথায় কি রইল! মানে—

সবই তোমার বাবার খাতায় আছে। বাবার কাজ বড় পরিষ্কার।

ঠোঁট মচকাইয়া বড় ভাই কহিল, খাতায় সে নেই, তা হ'লে আমি জানতাম। বাবা মা, দুজনের কাছেই টাকা আছে, সে সব হিসেবের বাইরের পুঁজি। সে দিন বললেন মনে নেই?

ছোট ভাই ভ্রূ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, হ্যাঁ বটে! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে বলিল, মানুষের শরীর!

প্রথমেই সরকার-দম্পতি কাশীতে নামিলেন। বাসায় উঠিয়া কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, যাক্, তিন সত্যির দায় থেকে মুক্ত হলাম। বাপ, মুখ-ফস্‌কে একটা কথা বলে কি তার প্রাশ্চিত্তির!

গিন্নী বেশ বড় বড় পেয়ারা কিনিয়াছিলেন, ছোট বঁটি পাতিয়া একটা পেয়ারা কাটিতে কাটিতে বলিলেন, প্রাশ্চিত্তি! তীর্থ করার নাম প্রাশ্চিত্তি? আর তোমরা বল মেয়েদের মত সংসারের মায়া আর কোন জাতের নেই! টাকা টাকা আর বিষয় বিষয়, পুরুষের মত নরুকে জাত আবার আছে না কি? আমি ম'লে ঠিক আবার তুমি বিয়ে করবে।

কর্ত্তা বলিলেন, উত্তর দিতাম, কিন্তু কে ফেসাদে পড়ে সে কথা ব'লে! হয় তো এবার সশরীরে স্বর্গ ঘুরিয়ে আনতে সত্যি করতে হবে।

গিন্নী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, আর তো কিছু জান না, শুধু কুট্ কুট্ ক'রে কথা কইতেই জান! নাও, এখন মুখে দাও কিছু, বলিয়া শ্বেতপাথরের একখানি রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টি সাজাইয়া নামাইয়া দিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, এটা? রেকাবিখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া

তিনি প্রশ্ন করিলেন, বাড়ি থেকে এনেছ বুঝি? পথে ঘাটে এসব জিনিস ভেঙে যায়।

বিরক্ত হইয়া গিন্নী বলিলেন, বাড়ি থেকে আনে না কি? কিনলাম এখুনি, বিক্রী করতে এসেছিল। তুমি বাজারে গিয়েছিলে তখনই এসেছিল।

কর্ত্তা এক টুকরা ফল মুখে তুলিয়া বলিলেন, হুঁ।

কিছুক্ষণ পর সহসা তিনি বলিলেন, দেখ, একটা কথা তোমায় বলি। একখানা বাড়ি এখানে ভাড়া ক'রে ফেলি। আর শেষ ক'টা দিন এইখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক। বহুদিন থেকেই এ আমার সংকল্প। তবে যদি বল, কই কখনও তো বল নি—সে বলি নি নানা কারণে, সংসারটা একটু গুছিয়ে ছেলেদের হাতে দিয়ে তার পর যাব এই মনে ছিল। কিন্তু এসেছি যখন, তখন আর নয়, কি বল তুমি?

একদৃষ্টে শূন্যের দিকে যেন ভবিষ্যতের গর্ভের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, কথা তো ভালই। কিন্তু ছেলেরা এখনও তেমন সক্ষম হ'ল কই? দেখলে তো আসবার সময় কি কাকুতি বেচারাদের। তার পর সহসা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া হুড় হুড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না বাপু, খেঁদীর বিয়ে আর বড় নাতির বিয়ে, এ না দেখে সে হবে না।

অতঃপর তর্কবিতর্ক করিয়া স্থির হইল, দুই মাসের স্থলে ছয় মাস অন্তত থাকিতে হইবে। ছয় মাস পরে আগামী মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভযোগ, কুম্ভ-যোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া বাড়ী ফেরা হইবে। আপাতত তীর্থগুলি ফিরিয়া কাশীতে আসিয়াই বাস করাই স্থির হইল। কর্ত্তা একখানা ছোটখাট বাড়িও কয়েক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সাবিত্রী-তীর্থে গিয়া পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে গিন্নী বিদ্রোহ করিয়া উঠিলেন, না বাপু, আমাকে তুমি দেশে রেখে এস। বাতের যন্ত্রণায় মরে গেলাম. বেলের [illegible] আমাকে যেতেই হবে। আর ছেলেদের মুখ মনে পড়ছে আমার!

কর্ত্তা হাসিলেন, বলিলেন, আজই লিখে দিচ্ছি ধর্ম্মরাজের তেল আর ওষুদের কথা। কাশী গিয়েই পাবে, বসে বসে মালিস যত পার কর না!

গিন্নী বলিলেন, তুমি আমাকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না দেখছি।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, বেশ তো, 'পুত্র পৌত্র স্বা-মীর কো-লে, একেবারে কা-শীর গঙ্গা-জলে' সে তো ভালই হবে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নী বলিলেন, হ্যাঁঃ, তেমনি ভাগ্য

কি আমার হবে! তেমন পুণ্যি কি-এমন করেছি বল; কখনও তুমি মনের মিটিয়ে ব্রত-পার্ব্বণ করতে দিয়েছ? আমার আবার ঐ ভাগ্যের মরণ না কি হয়!

কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে গিন্নী সে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহা-কুম্ভযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গিন্নী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, গিন্নী, কাকে দেখতে ইচ্ছে হয় বল, আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দিই।

দেখতে? একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পারলে না নিয়ে যেতে?

তার পর আবার বলিলেন, নাঃ থাক! কাউকেই আসতে হবে না। বড় খারাপ রোগ। তুমিই সদ্গতি করবে আমার! সাবধানে থেকো।

টপ টপ করিয়া কয় ফোঁটা জল কর্ত্তার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। এবার গিন্নী হাসিলেন, বলিলেন, বুড়ো বয়সে কেঁদো না ছি! আমার লজ্জা করছে!

কর্ত্তা কিন্তু গিন্নীর কথা শুনিলেন না, বড় ছেলেকে তার করিলেন, 'শীঘ্র এস, তোমার মায়ের কলেরা।'

তার পাইয়া সমস্ত সংসারটা চমকিয়া উঠিল। বড় ছেলে বলিল এমন যে হবে, এ আমি জানতাম!

ছোট ছেলে বলিল, কি বিপদ বল দেখি?

তিক্ত-হাসি হাসিয়া বড় ছেলে বলিল, এখন বিপদের হয়েছে কি? এই তো সবে প্রথম সন্ধ্যে! এখনও কত হবে, সেখানকার রোগ এখানে আসবে। তার পর অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, বারবার তখন আমি বারণ করেছিলাম! কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা তো শুনতে নেই, অপমান হয় যে!

সেই দিনই দুই ভাই আরও একজন সঙ্গী সহ রওনা হইয়া গেল। কিন্তু যখন তাহারা সেখানে পৌঁছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! বাসার যে ঘরে সরকার-দম্পতি ছিলেন সে ঘরখানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বাসার প্রায় সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। যে কয়জন ছিল তাহারা বলিল, বুড়ী মেয়েটী মরেছে কাল সকালে। বুড়ো ভদ্দরলোকটি চেষ্টাচরিত্র ক'রে তার গতি ক'রে এলেন দুপুর বেলায়, সেই দুপুর বেলা থেকেই তাঁরও আরম্ভ হ'ল। তার পর মশায়, অপরে কে কার মুখে জল দেয় বলুন; তবু সেবাসমিতিতে খবর

একটা দেওয়া হয়েছিল। তাও কেউ এল না! তার পর রাত্রে দেখলাম ভলেণ্টিয়ার এসে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

কোন্ সমিতির ভলেণ্টিয়ার বলতে পারেন?

কে জানে মশাই, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ভলেণ্টিয়ার, ঐ পর্য্যন্ত। আমরাও আজ মোটঘাট বেঁধেছি, এই দুপুরের ট্রেনেই ফিরব। তাহারা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অশ্রুসজল নেত্রে দুই ভাই ত্রিবেণীসঙ্গমে পিতামাতা উভয়ের তর্পণ সারিয়া গলায় কাছা পরিয়া বাড়ী ফিরিল; সঙ্গে রাজ্যের জিনিসপত্র, এলাহাবাদ ও কাশীর বাসায় গিন্নী বিহঙ্গিনীর মত একটি একটি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

সমারোহ-সহকারেই শ্রাদ্ধশান্তি হইল, ছেলেরা ত্রুটি কিছু করিল না। কিন্তু নিন্দুকে বলিল, করবে না তো কি, এক খরচে দুটো! একটা খরচ তো বেঁচে গেল।

কথাটা শুনিয়া বড় ছেলে বলিল, দুটোই করব আমরা, বৎসরকৃত্যতে এই খরচই আমরা করব! বাবা মা তো আমাদের অভাব রেখে যান নি কিছুর!

সত্য কথা, সরকার-কর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছেন প্রচুর। এই সেদিনও কর্ত্তা-গিন্নীর ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া চার হাজার টাকা ছেলেরা পাইয়াছে! দুই ভাই পরামর্শ করিয়া ব্যবসায়টা বাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। তিন দিন ধরিয়া গভীর আলোচনার ফলে ব্যবসায়ের পরিধি-পরিবর্দ্ধনের একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বড় ভাই বলিল, বেশ হয়েছে, বুঝলি, আমার তো মনে হয় এর চেয়ে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না!

ছোট ভাই বলিল, বাবা কিন্তু এতে মত দিতেন না। ঐ চেয়ার-টেবিল নিয়ে শহরে আপিস করা—

তার মানে ইংরাজী জানতেন না তিনি, বড় বড় বিজনেস সার্কলে মেশবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তার ওপর—

তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; রাত্রি ও দিনের মধ্যবর্ত্তী যবনিকাটা ছিঁড়িয়া গিয়া যেন একটা অকল্পিত আলোকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ছোট ভাই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। বাড়ির সম্মুখের রাস্তার উপর

একখানা গরুর গাড়ি হইতে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নামিতেছেন, কর্ত্তার কঙ্কাল, তার প্রেতমূর্ত্তি! দুই ভাইকে দেখিয়াই দুরন্ত ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে মূর্ত্তি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল, পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, আমি, আমি—

কথা শেষ হইল না, প্রেতমূর্ত্তি পথের ধূলার উপরেই সশব্দে লুটাইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানটা তাড়াতাড়ি সে দেহখানি তুলিয়া বলিল, জল আনেন গো, জল! ভিরমী গেইছেন গো, জল—জল!

এতক্ষণে বড় ছেলের সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিল, জল, জল। শীগগির জল আর পাখা—পাখা!

প্রেত নয়, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষই। সরকার-কর্ত্তাই দুরন্ত কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া সশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিবার ভুল এবং বুঝিবার ভুলে এমনটা হইয়া গিয়াছে। ভলেণ্টিয়ারে তাঁহার শবদেহ লইয়া যায় নাই, রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন অচেতন থাকিয়া চৈতন্য লাভ করিবার পর তিনি সংবাদ লইয়াছিলেন, কেহ আসিয়াছে কি না! কিন্তু কেহ আসে নাই শুনিয়া তিনি আর কোন কথা বলেন নাই, পরিচয় দেন নাই, জিনিসপত্রের খোঁজ করেন নাই, এমন কি আপনার রোগের যন্ত্রণার কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেও বলেন নাই। তবু তিনি বাঁচিলেন। হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মাটির পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া কিন্তু তাঁহার অন্তর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিবার সংকল্প লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

চেতনা লাভ করিয়া ছেলেদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা শুনিয়া কর্ত্তা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। গ্রামের পাঁচজনে আসিয়া জমিয়াছিল। কর্ত্তার সমবয়সী বৃদ্ধ চাটুজ্জে বলিলেন, যাক, যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন ধরাধরি ক'রে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও! ভাল ক'রে সেবা-যত্ন কর, ডাক্তার-টাক্তার ডাকাও!

কর্ত্তা বলিলেন, নাঃ, বাড়ির মধ্যে আর আমি যাব না। আমি কাশী যাব। যতক্ষণ আছি এইখানেই বেশ আছি আমি।

বেশ তো, এই বাইরের ঘরেই বিছানা করে দাও! সে বরং ভালই হবে,

ছেলেপিলের গোলমাল কচকচি কিছু থাকবে না। বল, বিছানা ক'রে দিতে বল।

বিছানায় শুইয়া কর্ত্তার চোখে জল আসিল। পাশেই পৌত্রী কমলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, জানিস কমলা, তোর ঠাকুমায়ের বাড়ি ফিরে আসতে বড় সাধ ছিল। আমিই—

আর তিনি বলিতে পারিলেন না, শুধু ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! কমলা পাকা গিন্নীর মত আপনার আঁচল দিয়া কর্ত্তার চোখের জল মুছিয়া দিয়া বলিল, সে আর আপনি কি করবেন বলুন। আপনি তো ভালই করতে গিয়েছিলেন। নিয়তির ওপর তো কারুর হাত নেই!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা বলিলেন, তা নইলে আমি ফিরে আসি! শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল, কি লজ্জা বল দেখি ভাই। আমার লজ্জা, ছেলেদের লজ্জা—অথচ ছেলেরা তো আমার সে রকম নয়। কিন্তু লোকে তো বলতে ছাড়বে না!

এ-কথার উত্তর কমলা দিতে পারিল না; কর্ত্তাও নীরব হইয়া ঐ কথাই বোধ করি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, ছোট একটি দামাল ছেলে বহির্ব্বাটী ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী দরজাটার উপরে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে একটুকরা মাটি লইয়া ভক্ষণ করিতেছে। লালাসিক্ত মৃত্তিকা-চিত্রিত মুখখানি দেখিয়া তিনি না হাসিয়া পারিলেন না। কিন্তু কে এটি!

কমলাও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, ও মা গো! কি খাচ্ছ গাঁট্টারাম, এ্যাঁ? সন্দেশ খাচ্ছ? কেমন লাগছে বাবু, ঝাল?

সঙ্গে সঙ্গে খোকা মাটিটা ফেলিয়া হু হু করিতে আরম্ভ করিল।

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, পাকামো দেখলেন?

ওটি কার ছেলে?

ওমা? চিনতে পারছেন না আমাদের গাঁট্টারামকে? ছোটকাকার ছোট খোকা!

এ্যাঁ, ওটা এত বিজ্ঞ হয়েছে এর মধ্যে? আন্—আন্, ওকে দেখি। আমরা যখন যাই তখন এইটুকু ছিল রে!

কর্ত্তা এবার উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, সব ছেলেদের ডাক্ ত! দেখি সব মশায়রা কে কত বড় হয়েছেন।

নাতিরা ভিড় করিয়া জমিয়া বসিল, তাহাদের পিছন পিছন এতক্ষণে বধূরা আসিতে সাহস পাইল, তার পর আসিল ছেলেরা। অপরাহ্ণে কর্ত্তা লাঠি ধরিয়া ঘর দোর সব ঘুরিয়া দেখিলেন। তাঁহার নিজের শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি? তাঁহার ঘরের মাটির মেঝে তুলিয়া ইঁট চূণ সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো? তাঁহার টাকা?

বড় ছেলে স্বীকার করিয়া বলিল, হ্যাঁ—চার হাজার টাকা ছিল।

সেটা আমাকে দাও।

আপনি টাকা নিয়ে কি করবেন? যখন যা দরকার হবে আপনি নেবেন!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ত্তা বলিলেন, এ ঘরে শুচ্ছে কে?

কমলাকে দিয়েছি ঘরখানা। জামাই আসেন প্রায়ই, ওর নির্দ্দিষ্ট একখানা সাজানো-গোছানো ঘর না থাকলে অসুবিধে হয়!

কর্ত্তা সেই সাজানো-গোছানোই দেখিতেছিলেন, কায়দা-করণ জিনিসপত্র সব নূতন! বেশ ভালই লাগিল। ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পা দুইটা কাঁপিতেছিল, তিনি বলিলেন, আমায় ধর তো কমলা!

দিন কয়েক পর।

ক্ষোভে উত্তেজনায় কর্ত্তা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। বেলা দশটা হইয়া গেল, প্রাতঃকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত ঔষধ কি পথ্য কিছুই তিনি পান নাই। আরও চটিয়াছিলেন তিনি কমলার ব্যবহারে। ফিরিঙ্গী মেয়ের মত সে তাহার স্বামীর সহিত হাত ধরা-ধরি করিয়া বেড়াইয়া ফিরিল। এ বাড়ির হইল কি? বধূরা তাঁহার সম্মুখেই স্বামীদের সহিত কথাবার্ত্তা কয়। তিনি চীৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন।

বড় ছেলে একটা জরুরী বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত ছিল, সে আসিয়া একটু কঠিন স্বরেই বলিল, আপনি কি পাগল হলেন না কি? একটু ধৈর্য্য ধরুন, বাড়িতেই জামাই রয়েছে, কমলা সেই জন্য আসতে পারে নি। মেয়েরাও সব ঐ জন্যে ব্যস্ত।

ছেলের কথার সুরে কর্ত্তা রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন, কি—কি? কি বলছ তুমি? আমার মুখের ওপর তুমি কথা কও!

কমলা [illegible]! ঔষধ ও পথ্য লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে

বলিল, আমায় বকুন দাদু, আমারই তো দোষ! যান বাবা, আপনি কাজে যান।

কমলার পিতা চলিয়া গেল। কমলা আবার বলিল, রাগ করেছেন দাদু?

কর্ত্তা বলিলেন, কতটা বেলা হ'ল হিসেব আছে?

তারপর ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়া অকস্মাৎ তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ক্ষিদে পেয়েছিল রে!

কমলা একটু হাসিল। বৃদ্ধ এবার রসিকতা করিয়া বলিলেন, কর্ত্তা বুঝি ছাড়ে নি নতুন-গিন্নী। বলিতে ভুলিয়াছি, পিতামহ পৌত্রীর নামকরণ করিয়াছেন 'নতুন-গিন্নী'। কমলা লজ্জিত হইয়া বলিল, কি যে বলেন আপনি! সে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

কর্ত্তা বলিলেন, কাউকে একটু ডেকে দিয়ে যাস তো ভাই. এই খেঁদী পটল কি যে কেউ হোক। বসে একটু গল্প-টল্প করি।

কমলা চলিয়া গেল। কর্ত্তা দুয়ারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ কাটিয়া গেল কিন্তু কেহই আসিল না। ক্লান্ত হইয়া কর্ত্তা শুইয়া পড়িলেন। নানা কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সহসা তাঁহার মনে হইল ব্যবসায়ের অবস্থাটা একবার নিজে তাঁহার দেখা দরকার।

বড় ছেলেটির মতিগতি বড় ভাল নয়। শহরে আপিস করিবে! তাহার উপর আজিকার কথাবার্ত্তা তাঁহার ভাল লাগে নাই। একখানা ঘর তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন. বেশ ছোটখাটো ঘর একখানি অবিলম্বেই আরম্ভ করাইতে হইবে। একখানা উইল, কমলাকে কিছু তিনি দিবেনই। ছেলেদের নামে 'পাওয়ার অব এটর্ণী' দেওয়া আছে, সেখানা অবিলম্বে বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ছেলেদের ডাকিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইবার সঙ্কল্প লইয়া উৎসাহের সহিত তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। শরীর? অনেকটা বল তিনি ইহার মধ্যেই পাইয়াছেন। ইহার পর একবার কোন স্থানে চেঞ্জে গেলেই তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন।

অপরাহ্নে ছেলেরা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। গম্ভীর হইয়া দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, এস, বস এইখানে।

বড় ছেলে বলিল, আমরা বলছিলাম কি, যে—মানে, আপনার শরীরের অবস্থা—

বাধা দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, ও চেঞ্জে গেলেই সেরে যাবে।

হ্যাঁ। আমরাও সেই কথা বলছিলাম! গঙ্গাতীরে অথবা কোন তীর্থে গেলে—ধরুন আপনার বয়সও হয়েছে—

তার মানে? কর্ত্তার ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, সমস্ত দিনের সঞ্চিত মনের শক্তি এক মুহূর্ত্তের যেন কোন্ বৈদ্যুতিক শক্তি-স্পর্শে বিলুপ্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল, দেখুন, ভুল যখন হয়েছেই তখন তো আর উপায় নেই। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি যখন হয়েই গেছে, তখন, মানে প্রবীণ লোক বলছে সব, আর আপনার বাড়িতে থাকা ঠিক নয়। কাটোয়ার গঙ্গাতীরে আমরা একখানা ঘরও ঠিক করেছি। কাটোয়া এই কাছেই. সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা একজন যাব, বামুন একজন থাকবে—

ছেলে বলিয়াই চলিয়াছিল, কর্ত্তা বিহ্বলের মত চারিদিকে একবার চাহিয়া ছেলের কথার মধ্যেই বলিলেন, বেশ।

কথা বলিতে ঠোঁট দুইটি তাঁহার থর্ থর্ কাঁপিয়া উঠিল; কথা শেষ হইবার পরও সে কম্পন শান্ত হইল না।

কিন্তু তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না, ঠিক এই সময়টিতেই কমলা সর্ব্বাঙ্গে মসীলিপ্ত চিত্রিত-বদন গাঁট্টারামকে দুই হাতে ঝুলাইয়া লইয়া প্রবেশ করিল—দেখুন ভূত দেখুন।

দুই ভাই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

তিন শূন্য

এক কঙ্কালসার মূর্ত্তি, পাঁজরাগুলো শুধু চামড়ায় ঢাকা, ক্ষুধাতুর অগ্নিগর্ভ কোটরগত চোখ, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, ক্রুদ্ধ কুকুরের মত মুখভঙ্গি, বিস্ফারিত ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে তীক্ষ্ণ হিংস্র শ্বাদন্ত দুটো, হাতেও তেমনই হিংস্র বড় বড় নখ, গলায় হাড়ের মালা, নগ্ন দেহ, পরনে কোমরে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে-নেওয়া রক্তচিহ্নময় এক টুকরো ন্যাকড়া, হা-হা ক'রে হাসতে হাসতে এসে দেশটায় প্রবেশ করল।

দুর্ভিক্ষ সে। তার অট্টহাসিতে দেশটা শিউরে উঠল। তার নিশ্বাসে বাতাস হয়ে উঠল রসহীন. সে চোখের দৃষ্টিতে দেশের জল গেল শুকিয়ে, তার ক্ষুধার্ত্ত উদর পরিপূর্ণ করতে ধরণী-জননীর প্রসাদ শস্যভাণ্ডার হয়ে গেল শূন্য; তারপর সে আরম্ভ করল মানুষের রক্ত মাংসে আপনার উদর পরিপূর্ণ করতে।

ভয়ার্ত্ত মানুষ উন্মত্ত পশুর মত ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে। সে হা হা ক'রে হাসে আর চীৎকার করে, হা অন্ন, হা অন্ন! মানুষও ভয়ার্ত্ত স্বরে কাঁদতে কাঁদতে প্রতিধ্বনি করে. হা অন্ন, হা অন্ন!

প্রকাণ্ড বড় ধনীর বাড়ি।

বাড়ির দোরে অন্নভিক্ষু কাঙালের ভিড় জমে গেছে। এক মুঠি ভাত, খানিকটা ডাল, শাকে পাতে খানিকটা অখাদ্য, এই বরাদ্দ। সেই অপরাহ্নে, বেলা চারটের সময়!

এরা কিন্তু সকাল থেকেই ব'সে থাকে। পেট জ্বলে খাক হয়ে যায় তবু প্রত্যাশায় ওরা সন্তুষ্ট হয়ে ব'সে থাকে! কেউ কারও মাথার উকুন বাছে, কেউ তাকিয়ে থাকে নর্দ্দমার দিকে—ওই দিকে ভাতের ফেন গড়িয়ে এসে পড়বে, ক্বচিৎ কেউ ব্যর্থ ভিক্ষায় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ফিরে ফিরে বেড়ায়।

চারটি মুড়ি দেবা মা!

কে লা, কে, কোন্ হতচ্ছাড়ি? মুড়ি দেবা মা, কেতাত্ত ক'রে দিলে!

কোন বাড়ির একটা চাকর কুয়ো থেকে জল তুলছিল, দুটো ছোট ছেলে একটা ভাঁড় হাতে এসে দাঁড়াল।

একটুকু জল দাও গো?

কাদের ছেলে বটিস?

মুচিদের মশায়।

কে কে আছে তোদের?

মা আছে শুধু বাবু, আর কেউ নাই।

হুঁ! কোনটো তোর মা? সেই গালকাটা মেয়েটা বুঝি?

হ্যাঁ মশায়। একটুন জল দাও মশায়!

ভাগ, হারামজাদা, ভাগ।

ছেলে দুটো ভয়ার্ত্ত ভাবে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে।

চাকরটা ঘৃণা ভরে মাটিতে থুথু ফেলে বলে, হারামজাদীকে দেখলে গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে। বেরো বেটার ছেলেরা!

ছেলে দুটো সভয়ে সরে আসে। চাকরটার কিন্তু মায়াও হয়, সে ডাকে, আয় আয়, নিয়ে যা!

ছেলে দুটো আবার সভয়েই এগিয়ে এসে ভাঁড়টা পেতে দাঁড়ায়। চাকরটা জল ঢেলে দেয়! কিন্তু তৃষ্ণা তো ওদের সহজ নয়, অগস্ত্যের তৃষ্ণা, তা ছাড়া আছে ক্ষুধা, ঢক ঢক ক'রে ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষিত ক'রে শূন্য উদর পূর্ণ ক'রে নিয়ে বলে, আঃ!

চাকরটা রসিকতা ক'রে বলে, আয়, গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিই, কুয়োর ভেতর দিনরাত জল খাবি।

একটা ছেলে ছুটে খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, পালিয়ে আয় রে, মারবে।

অপরটাও পালায়।

ওদিকে তখন কঙ্কালের দলের মধ্যে কলহ বেধে গেছে। নর্দ্দমা দিয়ে গড়িয়ে-পড়া ফেনের ভাগ নিয়ে কলহ। তারস্বরে কদর্য্য অশ্লীল কুৎসিত বাক্য-বিনিময়ের বিরাম ছিল না।

একটা পুরুষ একটা মেয়ের টুঁটি টিপে ধরেছে। মেয়েটার তিনটি ছেলে,

পুরুষটার অঙ্গে কেউ ধরেছে কামড়ে, একজন দুই হাতে তাকে খামচে ধ'রে আছে, আর একজন ইঁটভাঙা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করছে।

এ ছেলে দুটো সে দৃশ্য দেখে হাততালি নিয়ে নাচতে লাগল।

ওদিকে এক বৃদ্ধ, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, ব'সে ব'সে আপন মনে বকছে, জনমে আমি এমন ছাইপাঁশ খাই নাই. খাব না, খেতে পারব না। শালারা ভাত দিচ্ছে, পুণ্যি হচ্ছে, না ছাই হচ্ছে!

এক অন্ধ বুড়ি গালাগালি দিচ্ছে ঈশ্বরকে। একেবারে ওদিকে দুটি যুবতী মেয়ে বটপাতার ঠোঙায় ক'রে খাচ্ছে পাকা অশ্বত্থবীজ। সাঁওতালেরা খায়, খেতে দুর্গন্ধ তবু খাওয়া যায়। একটি মেয়ে বেশ সুশ্রী।

এই এই, মারামারি করছ কেন? এই, ছাড় ছাড়। এই, হারামজাদা শুয়ার!

একটি ভদ্রলোক পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ধমক খেয়ে পুরুষটি মেয়েটির গলা ছেড়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল মেয়েটার দুর্ব্বিনীত স্বার্থপর ব্যবহারের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও চীৎকার জুড়ে দিলে।

ভদ্রলোকটির কিন্তু সেদিকে মন ছিল না, দৃষ্টি ছিল না। সে দেখছিল ওই যুবতী মেয়ে দুটিকে।

মেয়ে দুটি সঙ্কোচে পেছন ফিরে বসল।

ভদ্রলোকটি ধমকে ব'লে উঠল, মারামারি করবি তো দোব সব তাড়িয়ে এখান থেকে।

অন্ধ বুড়ি বলে, তাই দাও বাবা, তাই দাও। আপদরা কোথা থেকে কোথা এসেছে তাই দেখ কেনে! দাও তাড়িয়ে।

ভদ্রলোক এইবার একে একে জিজ্ঞাসা করে, কার কোথায় বাড়ি।

তোর? তোর? তোর?

এই, তোদের দুজনের বাড়ি কোথা?

মেয়ে দুটি পেছন ফিরে তাকালে।

কোথায় বাড়ি?

একজন বললে, আজ্ঞে, সাউগাঁ মশায়।

হুঁ। এঃ তোদের কাপড়ের দশা যে দেখছি কিছু নেই রে!

এবার তারা দু'জনেই সকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়। ভদ্রলোকটি ইঙ্গিতময় হাসি হেসে মৃদুস্বরে বলে, দোব, কাপড় দোব।

তারা মুখ নামায়।

ভদ্রলোক পেছন ফিরে দেখলে, সকলে কুৎসিত হাসি হাসছে। সে চ'লে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাকে আবার দেখা যায়। একটা অন্তরালময় স্থানে দাঁড়িয়ে সে ওই ওদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হাতে তার কাপড়. পুরানো, কিন্তু সৌখীন-পাড় শাড়ি। অভাবপূরণই মনকে শুধু আকর্ষণ করে না, যেন তার সৌন্দর্য্যও মনকে বিভ্রান্ত করে, লোলুপ করে।

মেয়ে দুটির দৃষ্টিও সেদিকে পড়েছিল। কিন্তু সঙ্কোচে ভয়ে তাদের বুক দুর দুর করছিল। তারা মাঝে মাঝে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেও অগ্রসর হতে পারে না। আঃ, কি কোমল মসৃণ কাপড় দু'খানার জমি. আর কি সুন্দর ওর পাড়!

এই, আয় না!

মৃদুস্বরে কথা ব'লে হাত নেড়ে ভদ্রলোক ডাকে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন, আকাশ থেকে অবিরাম আগুন বর্ষণ হচ্ছে। পায়ের তলায় ধরিত্রী যেন উত্তাপে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কাঙালীর দল জটলা বেঁধে এক জায়গায় ব'সে নেই। এখানে ওখানে সামান্য সামান্য ছায়া বেছে নিয়ে শূন্য উদরেও উত্তাপের শ্রান্তিতে ঢুলছে।

বার বার এদিক ওদিক দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। অত্যন্ত নিম্নস্বরে কি ব'লে ভদ্রলোক বললে. এই নে, আবার নতুন দোব, টাকা দোব, বুঝলি?

মেয়েটা কিছুই বলতে পারে না।

আবার ভদ্রলোক বলে, বুঝলি?

মেয়েটা ঘাড় নাড়ে।

ওদিকে চীৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল, চীৎকার নয়, কোলাহল। উচ্ছিষ্ট বিতরণের সময় হয়েছে।

মেয়েটাও তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

অন্ধকার রাত্রি।

বনে বিচরণ করে শ্বাপদের দল, গলিতে ঘুঁজিতে স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে নিঃশব্দে এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়ায় সরীসৃপ, সাপ, বিছে; কেঁচোগুলোও মাটি তোলে, গায়ে ঝরে লালা।

তার মাঝে মানুষও বেড়ায়, এমন নিঃশব্দে সন্তর্পণে। অন্ধকার, কোথায় অন্ধকার? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ ক'রে বহুদূর ঘুরে বেড়ায়। সেই ভদ্রলোকটি ঘুরে বেড়ায় হাতে একটা ঠোঙা।

কই, কোথায়? এইখানেই তো থাকবার কথা! কই?

একটা ভাঙা ঘর, ঘরের সম্মুখে খানিকটা পরিষ্কার স্থান, তার পরই একটা বাঁধাঘাট। এই ঘাটেই তো থাকবার কথা!

ওখানে কে শুয়ে? পরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানটায় শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে কে?

তীব্র দৃষ্টি হেনে চেনা গেল, সেই কাণা বুড়িটা।

ঘরে কাসছে কে?

কান পেতে শুনে বোঝা গেল, পুরুষ। তবুও ঘরে ঢুকে দেখলে, একটা পুরুষই, কিন্তু কে তা বোঝা গেল না, বোঝবার দরকারও নেই!

কোথায়, কোথায়?

উন্মত্ত লালসা বুকে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। মাথার ওপর আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ঝলমল করছে, মাঝে মাঝে দু'একটা খ'সেও যাচ্ছে।

ওই বেনেদের প'ড়ো বাড়িটায় নেই তো?

আবার সন্তর্পণে এগিয়ে চলে। হ্যাঁ, মানুষের নিশ্বাস পাওয়া যায়।

চোখের দৃষ্টি জ্ব'লে ওঠে, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।

এই তো! হ্যাঁ!

না, এ নয়! এই, হ্যাঁ এই।

তারপর?

মেয়েটা সভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে চীৎকার বন্ধ হয়ে যায়, মুখের ওপর হাত চাপা পড়ে।

চুপ!

মেয়েটা প্রাণপণে বাধা দিতে চায়, কিন্তু পারে না। নিস্তেজ, অসাড় হয়ে পড়ে ক্রমে।

মেয়েটা কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কি সকরুণ কান্না! নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা খ'সে যায়।

আঃ, কাঁদছিস কেন? এই নে, টাকা নে।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও রজতপ্রভা ঢাকা পড়ে না। কিন্তু তবুও সে কাঁদে।

ও, দাঁড়া দাঁড়া এক ঠোঙা খাবার এনেছি নে।

অদূরে ভাঙা প্রাচীরের উপর রক্ষিত ছিল ঠোঙাটা। সেটা এনে হাতে তুলে দিলে।

মেয়েটা হাত দিয়ে অনুভব করে, কি বস্তু।

লোকটি চ'লে যায়।

মেয়েটা ব'সে থাকতে থাকতে একটুকরো খাবার মুখে তোলে। অপূর্ব্ব সুস্বাদু। আবার একটুকরো মুখে তোলে, আবার! তারপর সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে সে নিঃশেষ ক'রে খেয়ে ফেলে। সঙ্গী বোনকে পর্য্যন্ত জাগায় না। সে নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সেই অন্ধকার রাত্রে সেই ভীষণ কুৎসিতমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ ব'সে ব'সে মানুষের চামড়ার খাতায় হাড়ের কলম দিয়ে জমা-খরচ করছে। কালি নেই. লাল কালি ফুরিয়ে গেছে, যেটুকু অবশিষ্ট তার রং হয়ে গেছে জলের মত। চামড়ার ওপর চিরে চিরে লেখে সে। বিধাতার হিসাব-নিকাশের খাতার ক-পাতা লেখবার ভার এখন তার ওপর পড়েছে। মুখে তার বীভৎস হাসি, হিংস্র আনন্দে ভীষণ দাঁতগুলি ঈষৎ বিস্ফারিত, সে বিস্ফারণের জন্য কদর্য্য নাকটা কুঁচকে উঠেছে।

হিসেব তার অনেক।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা যায়, একটা কঙ্কালসার জীর্ণ বৃদ্ধাকে জীবন্ত অবস্থাতেই টেনে নিয়ে গেছে শেয়ালে। প্রায় অর্দ্ধেকটা তার ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। বক্ষপঞ্জরটাই আগে শেষ করেছে। বুড়ির চোখ দুটো মৃত্যুর পরও বিস্ফারিত হয়ে আছে। আতঙ্কিত বিস্ফারিত দৃষ্টি।

এদিকে সেই মেয়েটার এখন অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

মাথার চুল রুক্ষ নয়, পরনে পরিচ্ছন্ন সৌখিন কাপড়, মুখেও তার

অনাহারের ক্লেশের ছাপ আঁকা নেই, অতি সূক্ষ্ম তৃপ্তি হাসি ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্নভাবে খেলা করে।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই তার শরীর কেমন অসুস্থ হয়ে উঠল। একটা জর্জ্জর অবসাদময় ভাব, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। কিছু ভাল লাগে না। আর কয়দিন পরই সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে গেল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে।

মেয়েটা শঙ্কিত বিস্ময়ে আপন অঙ্গের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। অবশেষে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

রাত্রে সে আপনার জীবন-দেবতার কাছে করুণভাবে সব নিবেদন করে।

সে আশ্বাস দেয়, ভয় কি, ভাল হয়ে যাবে। ওষুধ এনে দোব।

পরম আশ্বাস নিয়ে মেয়েটি ব'সে থাকে। রোজ ভাবে, সে আজ আসবে ওষুধ নিয়ে; যাদুমন্ত্রের মত এক দিনে সমস্ত রোগ মুছে যাবে। প্রভাতে উঠে দেখবে, তার দেহ আবার পূর্ব্বের মত মসৃণ শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় কি? সে আর আসে না। তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না। আর পেলেই বা কি হবে? দিনের আলোতে কেমন ক'রে জাগ্রত পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে তার কাছে দাবি জানাবে? সে দাবি কি তার আছে? কল্পনা মাত্রেই ভয়ে তার বুক গুর গুর ক'রে ওঠে!

কয়দিন পর আর তাকে গ্রামে দেখা যায় না। সে পালায়, তাদের স্বজাতীয় গ্রাম্য চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে চ'লে যায়।

বৎসর তিনেক পর আবার তাকে দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু তবুও তার কঙ্কালসার দেহ, সর্ব্বাঙ্গে থকথকে ঘা। ক্ষতের দুর্গন্ধে মানুষ দূরের কথা পশুরও বমি আসে।

মেয়েটার কোলে একটা শিশু।

দুর্ভিক্ষের বরলাভ ক'রে এসেছে সে; তেমনই কদর্য্য চেহারা, তার ওপর পঙ্গু, পশুর মত হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলে। চোখে পিচুটি, অবিরাম বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে; মুখে ভাষা নেই, রব আছে, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা।

পশুর মত চীৎকার ক'রে সে মায়ের স্তনবৃন্ত দন্তাঘাতে রক্তাক্ত ক'রে

তাই লেহন করে। কেন, কেন সেখানে স্তন্য সঞ্চিত নেই? উদরে যে তার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

মাও দারুণ যন্ত্রণায় ছেলেটাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে।

এই মাগী, এমন ক'রে ছেলে মারছিস কেন?

মেয়েটা চমকে ওঠে, তার মুখ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে মৃদুস্বরে বললে, বাবু!

আঃ, সর সর সর। কি দুর্গন্ধ।

আমাকে চিনতে লারছ বাবু? আমি—

হারামজাদী, বেরো, বেরো বলছি।

ভদ্রলোক সত্যই তাকে চিনতে পারেন না। চেনবার উপায়ও রাখে নি রোগে।

মেয়েটা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আর কিছু না, অভিসম্পাত দেবার মতনও মনের উগ্রতা নেই! একটা অত্যন্ত শিথিল হতাশায় জীবনের তারগুলো যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। আঘাতের প্রতিঘাতে ধ্বনি তোলবার শক্তিও তাদের নাই!

আরও পনের বৎসর চ'লে গেছে।

রোগগ্রস্তা কুৎসিত মেয়েটা অনেক আগেই ম'রে খালাস পেয়েছে। কিন্তু বর্ব্বর পশুর মত ছেলেটা বেঁচে আছে। সে হাতে পায়ে হেঁটে বেড়ায়, এখনও মুখ দিয়ে লালা ঝরে, চোখে ঝরে জল।

বোধ করি, মায়ের বুকের বিষ সে উদ্‌গার করে, আর মায়ের শেষ-করতে-না-পারা কান্না কাঁদে।

তারই মধ্যে সে হাসে। হাতে পায়ে হেঁটে সে গিয়ে উপু হয়ে গৃহস্থের দোরে বসে, আঁউ আঁউ ক'রে চীৎকার করে।

গৃহস্থেরা হাসে, আবার করুণাও করে, উপবাসী তাকে একদিনও থাকতে হয় না।

ছেলেরা তাকে ডাকে, হনুমান।

বয়স্কেরা বলে, ল্যালা।

ল্যালা ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালে। তার যত কৌতুক পশুর সঙ্গে,

ছাগল ভেড়ার বাচ্চা ধ'রে তাদের অসহ্য যন্ত্রণা দেয়, তারা চীৎকার করে, ও হাসে। জঙ্গলে জঙ্গলে সে হনুমান ধরবার জন্যে ছোটে।

ক্ষুধার উদ্রেক হ'লেই গ্রামের মধ্যে ছুটে আসে।

গৃহস্থের মেয়েরা বলে, এসেছিস?

সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে হাসে।

দে রে, ল্যালা এসেছে. এ'টোকাঁটাগুলো দে।

ল্যালা তাই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খায়! মাঝে মাঝে কোন খাদ্য ভাল লাগলে চেঁচায়, আঁ—আঁ—আঁ।

সেই দ্রব্যটা তুলে দেখিয়ে চেঁচায়, পুনরায় না-পাওয়া পর্য্যন্ত থামে না।

সে জানে না, কতখানি তার দাবি। কিম্বা হয় তো মানে না।

মেয়েরা হেসে বলে, ল্যালা নাছোড়বান্দা।

এক একদিন রাত্রে অকস্মাৎ ক্ষুধা বোধ হলে সে লোকের গোশালায় গরুর ডাবা খুঁজে বেড়ায়। সে জানে ওর মধ্যে পচা বাসি ভাত পাওয়া যায়!

অকস্মাৎ ল্যালা যেন কেমন হয়ে ওঠে। ক্ষুধার তাড়না বোধ হয় ক'মে গেছে। সে এখন বনে জঙ্গলেই ব'সে থাকে, যতক্ষণ দিবালোক থাকে ততক্ষণ সে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পশুদের খেলা দেখে। মধ্যে মধ্যে আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে।

কখনও কখনও নিদারুণ অস্থিরতায় প্রচণ্ড আবেগে সে মাটির বুকে গড়াগড়ি দেয়। কখনও বা শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে ব'সে থাকে।

রাত্রির অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখা যায় না, তখনই সে গ্রামে এসে আহারের অন্বেষণ করে—গোশালায়, গৃহস্থের বহির্দ্বারে।

সেদিন অন্ধকারে সে আহার খুঁজছিল। কোথাও এক কণাও নেই। ল্যালা ব'সে ভাবে। মধ্যে মধ্যে আহারের চিন্তাও তার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

আবার কতক্ষণ পর তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভূত হয়। সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লোকের বন্ধদ্বারে আঘাত ক'রে ডাকে, আঁ—আঁ—আঁ।

কিন্তু গভীর ঘুমে নিস্তব্ধ পুরী, সাড়া মেলে না। ল্যালা আবার চলে।

একটা নর্দ্দমা। ল্যালা তারই সম্মুখে ব'সে ভাবে। তারপর সে ওই নর্দ্দমা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তবু তার প্রচণ্ড চেষ্টা শিথিল হয় না। অবশেষে সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। উঠানেই রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন গাদা হয়ে আছে। ল্যালা পরমানন্দে সেইগুলো চাটে।

আর? আর কই? সে ঘরের বারান্দায় ওঠে। সম্মুখের ঘরে মৃদু আলোক জ্বলছে। ল্যালা দরজার সম্মুখে গিয়ে দরজাটা ঠেলে।

দরজা খোলে না।

এবার সে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বন্ধদ্বারটা ঠেলে। ঘরের খিলটা বোধ হয় শক্ত ছিল না, সেটা এবার ভেঙে খুলে যায়। ল্যালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মৃদু আলোকে অস্পষ্ট দেখা যায় চোদ্দ পনেরো বৎসরের একটি মেয়ে পরম নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। পাশে আর দু' তিনটি ছোট ছেলে। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তার সর্ব্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে তার নগ্ন রূপ মৃদু-আলোকচ্ছটায় অপরূপ লাবণ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

ল্যালার বুকের মধ্যে ক্ষুধার আবেগ মুহূর্ত্তে লুপ্ত হয়ে যায়। জেগে ওঠে সেই প্রচণ্ড আবেগ—অদ্ভুত—দুর্নিবার। দেহে তার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘ'টে যায়।

তারপর?

ফুলের মত নিষ্পাপ বালিকা, আর্ত্ত চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু ল্যালার নিষ্পেষণে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নির্ব্বাক হয়ে যায়। ল্যালা স্তব্ধ; তার রব পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

অদৃশ্য লোকে, বিধাতার খাতার হিসেব-নিকেশ মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ নেই। সেখানে জমা-খরচের একটি হিসেবে সেদিন দুই দিকেই দাঁড়িটানা যায়। একটা হিসেব শেষ হ'ল।

নীচে পড়ল তিনটে শূন্য।